দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

২৪ অক্টোবর - ২০১১, ৬ কার্তিক - ১৪১৮ ।। ৬৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা

চীনা আক্রমনের ৫০ বছর

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৮

অন্তর্দলীয় সংকটে রাজ্যের শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই ❑ ৯

কলকাতার বেশিরভাগ নতুন সংবাদপত্রই চিটভাণ্ডের টাকায় চলছে ❑ ১০

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পাঠ স্কুলপাঠেও থাকা দরকার ❑
সাধন কুমার পাল ❑ ১১

সার্বিক শান্তি : পশ্চিমী নেতৃত্বের কোমল রূপ ❑ রামমাধব ❑ ১৩

চীনা আক্রমণের ৫০ বছর : হেল্ডারসন ব্রুকস রিপোর্ট কি অজানাই থেকে যাবে? ❑
রণজিৎ রায় ❑ ১৫

চীন আক্রমণের অর্ধশতাব্দী ও কমিউনিস্টদের নির্লজ্জ ভূমিকা ❑ নিশাকর সোম ❑ ১৭

সিকিমের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত গ্রামে উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী'র সেবাকাজ ❑ ২০

খোলা চিঠি : টাকা ছাড়াই ফাঁকা আওয়াজে মাও-জুজু দমবে কি ❑
সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

আশ্চর্য মাস অক্টোবর ❑ ডঃ সর্বাণী চক্রবর্তী ❑ ৩৪

রাজার কর্মী বাছাই ❑ চতুর্থ পাণ্ডব ❑ ২৫

পুজোর মরসুমে নারীরূপী দেবীপূজা ❑ মিতা রায় ❑ ২৭

নেহরু-কংগ্রেস আজন্ম আর এস এস-এলার্জির শিকার ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

হকি : এশিয়ার চ্যাম্পিয়ান হয়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নবসের ছেলেরা ❑
জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

অন্যরকম : ১৯ ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **সু-স্বাস্থ্য : ২৬** ❑
সমাবেশ-সমাচার : ২৮ ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩** ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

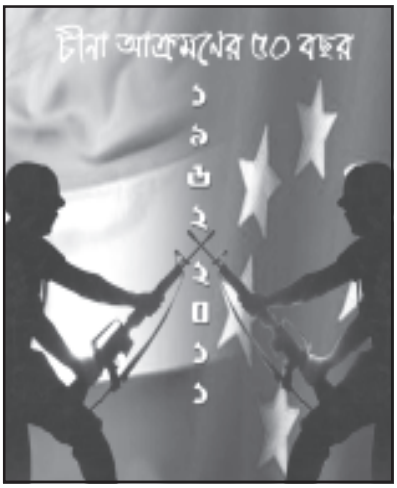

চীনা আক্রমণের ৫০ বছর
পৃষ্ঠা — ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ৬ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৪ অক্টোবর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

দীপাবলী সংখ্যার
আকর্ষণ

ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষে স্বস্তিকা'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

নাম তাঁর মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষান্তে স্বামীজী তাঁর নাম রেখেছিলেন 'ভগিনী নিবেদিতা'। রবীন্দ্রনাথ এঁকেই বলেছিলেন, 'লোকমাতা'। সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে স্বামী বিবেকানন্দের এই মানসকন্যাটি যেভাবে ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করেছেন তা আমাদের চির-গৌরবের। তাই তাঁর প্রয়াণ শতবর্ষে দীপাবলী'র সহস্র আলোকশিখার মধ্যে একটি চির প্রজ্জ্বলিত অনির্বাণ আলোক-শিখাকে নতুনভাবে জানবার চেষ্টায় আমাদের এই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর চিন্তায় চেতনায় মিশে থাকা ভারতবর্ষ ও তার সনাতন ধর্ম, মাতৃত্বের মহিমা, আপোষহীন সেবাকার্য সহ নানা নতুন দিক আলোকপাত করেছেন—

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, আশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ স্বরূপ ঘোষ, ঋতা চক্রবর্তী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, অর্ণব নাগ প্রমুখ।

—ঃ এছাড়াও আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে থাকছে ঃ—

মাননীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের বিজয়া দশমীর ভাষণ

ও

দেবীপ্রসঙ্গ : লিখেছেন স্বামী বেদানন্দ

৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হবে।। শীঘ্র কপি বুক করুন ।। দাম : ৮.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

প্রশান্তভূষণের বাক্যদূষণ

দিনকয়েক পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অংশ নয় এমন দাবি জানাইয়াছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধি তাহির হুসেন। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের কথাও বলিয়াছিলেন। এমন দাবি পাকিস্তান মাঝে মাঝেই করিয়া থাকে। শুধু দাবি করা নয়, কাশ্মীরকে অধিকার করিবার জন্য অনুপ্রবেশ, হামলা, জঙ্গীদের মদত প্রভৃতি নানা কৌশল পাকিস্তানের তরফ হইতে সারা বছর চলিতেই থাকে। কাশ্মীরের জন্য তিন তিনবার যুদ্ধ করিয়াছে পাকিস্তান। তবু কাশ্মীর করায়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই। দেশের সেনাবাহিনী ও দেশপ্রেমিক মানুষ প্রাণ দিয়া কাশ্মীরকে রক্ষা করিয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্তান এক নতুন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে— ভারতের বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া নিজেদের এজেন্ট বানাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহাদের দিয়াই কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করাইতেছে। এদেশের বাক্‌স্বাধীনতার নামে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থ বা অন্যকিছুর লোভে সেই ফাঁদে পা দিতেছেন। সেকুলার রাজনীতির ধ্বজাধারী ইউপিএ সরকার এমন প্রচারকে ইন্ধনও জোগাইতেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর সংক্রান্ত মধ্যস্থতাকারী দলের আচরণ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সাম্প্রতিক কালের টিম আন্নার সদস্য হিসেবে বিখ্যাত হওয়া আইনজীবী প্রশান্তভূষণ কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তানের নবতম ভারতীয় দাবিদার। তাঁহার মতে, কাশ্মীরের মানুষ যদি ভারতের সঙ্গে থাকিতে না চান তবে তাঁহাদের পাকিস্তানের হাতে সঁপিয়া দেওয়াই উচিত। তিনি পাকিস্তানের গণভোটের দাবিও সমর্থন করিয়াছেন, দাবি করিয়াছেন ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের। অবশ্য শুধু সরকার নয়, প্রশান্তভূষণের এমন দেশবিরোধী মন্তব্যের জন্য প্রতিবাদ করিয়াছে কিছু দেশপ্রেমিক যুবক। অবাক হইবার মতো ঘটনা হইল স্বাধীন ভারতের কোনও কোনও নাগরিক এমন প্রতিবাদেরও নিন্দা করিতেছেন। এক্ষেত্রে প্রশান্তভূষণ যাহা বলিয়াছেন তাহা পাকিস্তানের কণ্ঠস্বর মাত্র। তাঁহার মন্তব্যকে সমর্থন করিলে বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রামে বলি প্রদত্ত আত্মাদের অপমান করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী হিসাবে বাক্‌স্বাধীনতার নামে এভাবে পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করা দেশবিরোধী কাজ। স্বয়ং আন্না হাজারেও বলিয়াছেন, ওরকম মন্তব্য করা অনুচিত। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং থাকিবে।

কংগ্রেসের যে মুরুব্বিরা এতদিন ধরিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন টিম আন্না সঙ্ঘ এবং বিজেপির হাতে তামাক খাইতেছে, তাহাদের এখন জানা উচিত সঙ্ঘ এবং বিজেপি বরাবরই মনে করে কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কাশ্মীরকে দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিতেই ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ জীবন দিয়াছেন। জওহরলাল নেহেরুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়াসে কাশ্মীরকে সমগ্র ভারতের মূলস্রোতে পরিপূর্ণভাবে মিশাইবার জন্য বিজেপি এখনও লড়াই চালাইতেছে। আজ একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে শত জঙ্গীহামলা, অনুপ্রবেশ, ওকালতি হইলেও কাশ্মীর কোনদিনও পাকিস্তানের হইবে না। প্রশান্তভূষণের উপর হামলা নিন্দনীয় হইলে জম্মু-কাশ্মীর লইয়া তাঁহার মন্তব্য আরও বেশী নিন্দার যোগ্য। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দিবার পক্ষে যিনি সওয়াল করিতেছেন এদেশের দেশপ্রেমিক মানুষ নিশ্চয় তাহাকে ফুলমালা দিয়া বরণ করিবে না। কেননা তাহা সর্বদা অনুচিত।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

লোকের মনে যাহা ছিল না, মহাপুরুষদের মনে তাহা শূন্য হইতে আসিয়া গজাইয়া উঠে না। ইঁহারাও নিজ নিজ কাল শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জগতে নব নব মত ও সিদ্ধান্ত, সাধন ও আদর্শের প্রচার করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সম্বন্ধে প্রাচীন আর্যাবর্তের লোকের মনে যে সকল ভাব বিন্দু বিন্দু করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাই যেন একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া বুদ্ধদেবের মধ্যে মূর্তিমান হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে ইহুদীয়, গ্রীসে ও রোমে খৃস্টশতাব্দীর প্রারম্ভে ও অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ভাব লোকের মনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই কেন্দ্রীভূত ও প্রত্যক্ষ করিয়া যীশু খৃস্টের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের এই বাংলাদেশে বহুলোকের অন্তরে যে বৈষ্ণবভাব অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই ঘনীভূত করিয়াই মহাপ্রভুর অবতার হয়। দেশে যাহা প্রস্ফুট, মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহাই প্রস্ফুট, দেশে যাহা মূক মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা মুখর, দেশে যাহা নিরাকার ও অমূর্ত ভাবরূপে বিদ্যমান থাকে, মহাপুরুষদের মধ্যে তাহাই সাকার ও মূর্তিমান হয়।

—বিপিনচন্দ্র পাল

আসানসোলে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলি

মুসলমান তোষণের বলি সুজিত বর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আসানসোলে দুর্গা পুজোর বিজয়ার বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেল। বিজয়ার আনন্দ নিমেষের মধ্যে বিষাদে পরিণত হলো। তরতাজা যুবক সুজিত বর্মার গলা ভেদ করে গেল পুলিশের গুলি। ঘটনার সূত্রপাত আখড়ার শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে। প্রতি বছরের মতো আসানসোলের হাটন রোডের মসজিদের সামনে দিয়ে মাইক বাজিয়ে হিন্দুদের শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় গাজোয়ারি করে দাদা গোছের জনৈক মুসলমান শোভাযাত্রার মাইকের তার কেটে দেয়। তাই নিয়ে বচসা, গণ্ডগোল। তখনকার মতো শোভাযাত্রা পার হলে আসরে অবতীর্ণ হন মন্ত্রী মলয় ঘটক। অন্যান্যবারও ওই পথ দিয়েই শোভাযাত্রা যায়। পুলিশী বন্দোবস্ত থাকে। এবার পুলিশ ছিল না। মন্ত্রী ও পুলিশ ফেরার পথে হিন্দুদের অন্য পথের নির্দেশ দেন। এটাই সোজা পথ বলে হিন্দুরা ঘুরপথে ফিরতে অস্বীকার করাতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। পুলিশের গুলি সুজিতের গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। যদিও ঘটনাস্থল ওয়ার্ড নম্বর ৮ কিন্তু সুজিতের বাড়ি ১৬নং ওয়ার্ডে। বাউরিপাড়া ও মেথরপাড়ার ২২টি আখড়া শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ৬ অক্টোবর সুজিত নিহত হওয়ার পর পুলিশী দৌরাত্ম্য আরও বাড়ে। একাদশীর দিন পুলিশ মেথরপাড়া থেকে পাঁচজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মার-ধোর করে। তাদেরকে পরে পুলিশই হাসপাতালে ভর্তি করে। তাদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার করা হয়। হিন্দুদের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও এফ আই আর নিতে অস্বীকার করে থানা। পরে এফ আই আর হয়।

এরপর যথারীতি শান্তি বৈঠক। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। হিন্দুদের বক্তব্য— আখড়ার শোভাযাত্রা নিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আটদফা বৈঠক হয়েছিল। হিন্দুরা কোনওদিন মুসলমানদের ধার্মিক ব্যাপারে আপত্তি জানায়নি। বুধাতে নতুন তিনটি মসজিদ হলেও হিন্দুরা কোনও আপত্তি করেনি। আখড়া শোভাযাত্রার পথ হিন্দুরাই ঠিক করে থাকে। এরপর ৯ অক্টোবর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে বনধ্ ডাকা হয়। ৮ অক্টোবর বন্ধের জন্য তিনজন অটোতে মাইক নিয়ে প্রচারে বের হলে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ অটো সহ ওই তিনজনকে আটক করে। পরে তাদের মুক্তি দেয়। অথচ তৃণমূলের পতাকা সহ প্রায় ৫০টি মোটরবাইক বন্ধের বিরুদ্ধে প্রচারে বের হলেও পুলিশ নির্বিকার থাকে। বনধ্ স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তৃণমূল ক্যাডাররা বনধ্ ভাঙতে পথে নামে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গাড়ি যাতায়াত করলেও বন্ধের পক্ষে পিকেটিং না করা সত্ত্বেও বনধ্ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল বলে জানা গেছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ওমনারায়ণজী এই ঘটনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা পাঁচজনকে অসুস্থ অবস্থায় জোর করে সুস্থ লিখিয়ে নিয়ে পুলিশ জেলে পাঠিয়েছে। হিন্দুদের পক্ষ থেকে তাদের অবিলম্বে মুক্তি, দোষী পুলিশদের শাস্তি এবং মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য কোনও দলকে হিন্দুদের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়নি। উল্টে গত ১২ অক্টোবর তৃণমূল সভা করে এই ঘটনার জন্য আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সিপিএম-কে দায়ী করেছে। এলাকায় বর্তমানে আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অরাজনৈতিক লোকজনদের বক্তব্য অত্যধিক তোষণ করতে গিয়েই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল।

বনগাঁর সুটিয়াতে বাংলাদেশীদের হানা : ঘরবাড়ি ভাঙচুর, দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী চুক্তির কালি শুকোতে না শুকোতেই, একদল বাংলাদেশী মুসলমান দুষ্কৃতী বনগাঁ সীমান্তের সুটিয়া গ্রামে হানা দিল। মৈত্রী চুক্তি মোতাবেক গুলি না চালানোর নির্দেশ থাকায় বি এস এফ এখন কাঠের পুতুল। দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগ নিয়েই ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ-মহকুমার সুটিয়া গ্রাম ও বাজারে গত ১১ অক্টোবর রাত ১২টা নাগাদ কোদালিয়া খাল পেরিয়ে আক্রমণ করে। এরা সংখ্যায় ৪০০-৫০০। গ্রাম ও বাজার সংলগ্ন ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ভাঙচুর করে ও আগুন লাগিয়ে দেয়। সশস্ত্র বাংলাদেশী মুসলমানদের বাধা দিতে গেলে ১০ জন হিন্দু আহত হয়। এদের মধ্যে ৫ জনের আঘাত গুরুতর এবং তারা এখন বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুবীর বিশ্বাস, মুরারী বিশ্বাস, মদন মণ্ডল, যাদব মণ্ডল ও দীপঙ্কর মণ্ডলের ঘরবাড়ি দুষ্কৃতীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। এখান দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অবাধে গোরু-পাচার ও অনুপ্রবেশ হয়ে চলেছে।

পরের দিন স্থানীয় এস পি, বি এস এফের সি ও (কল্যাণী), প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দুলাল বর, জেলাপরিষদের সদস্যা রহিমা বিবি সুটিয়াতে যান। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনার দায় বি এস এফের উপর চাপাতে চায়। বি এস এফের পক্ষে বলা হয়, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই এবং গুলি চালানোরও নির্দেশ নেই। দুলাল বর অভিযোগ করেন, গোয়ালদা, আঙ্গারপুকুর, আশসিংড়ী, বাগানগ্রাম, মালিপোতা গ্রাম দিয়ে গোরু-পাচার চলছে। দিল্লী-হরিয়ানা থেকে গোরু এনে স্থানীয় মেহেরপুকুর গ্রামকে কেন্দ্র করে গোরু-পাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব গ্রামগুলি গোরু-পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তারা উল্টে হুমকি দেয়— 'এখনও বেঁচে আছিস, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।'

বাগদার তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসও ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে এলাকায় এখন উত্তেজনা রয়েছে।

ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলনে স্বয়ংসেবকরা বরাবরই রয়েছে : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বর্তমান আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যোগদানের বিষয়টি নিয়ে যে চর্চা চলছে তা উদ্বেগজনক শুধু নয়, এই আন্দোলনকে দুর্বল করার এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলেই মনে হচ্ছে। গত ১৫ অক্টোবর গোরখপুরে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠক চলাকালীন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী এক প্রেস বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভাইয়াজী বলেছেন, দেশের নাগরিক হিসাবে আন্না হাজারের ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলনে স্বয়ংসেবকরা যোগ দিয়েছেন। সঙ্ঘের পরম্পরা হলো দেশের কল্যাণের জন্য যে কোনও কাজকেই সমর্থন করে থাকে এবং এর জন্য সঙ্ঘ কোনও কৃতিত্ব দাবী করে না। আন্না হাজারে এক আদর্শনিষ্ঠ নাগরিক। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাস ধরে তিনি সাফল্যের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। এই আন্দোলনের সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তব্য ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সারা দেশে সঙ্ঘের হাজার হাজার কার্যকর্তা পরিচিত ও প্রভাবিত। কিন্তু সম্প্রতি কংগ্রেসের মহাসচিব উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যে বক্তব্য রেখেছেন তার প্রত্যুত্তরে আন্না হাজারের বক্তব্য হিসাবে সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে তা বুঝে উঠতে পারিনি শুধু নয়, তা বেদনাদায়কও। শ্রী হাজারে সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত-এর বক্তব্য বিষয়ে এবং আন্দোলনের সমর্থনে যে পত্র পাঠানো হয়েছিল তা ষড়যন্ত্রমূলক হিসাবে দেখেছেন বলে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী হাজারের মতো ব্যক্তিও কুটিল রাজনৈতিক চালে প্রভাবিত হয়েছেন, এটা খুবই দুঃখজনক। দেশ ভ্রষ্টাচার মুক্ত হোক তা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে কোটি কোটি দেশবাসীরও আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনকে সবরকম কুটিল ও বিকৃত রাজনীতি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের নেতৃত্বকেই নিতে হবে।

আর এস এসের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের বৈঠক চলাকালীন সাংবাদিক সম্মেলনে মনমোহন বৈদ্য ও ভাইয়াজী যোশী (বাঁ দিক থেকে)।

‘কলকাতায় সর্দার প্যাটেলের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় অনেক বছর লাগল’

খেদ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল

সংবাদদাতা॥ ‘কলকাতা মহানগরীতে লৌহমানব সর্দার প্যাটেলের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ষাট বছরের বেশি সময় লেগে গেল।’ গত ১০ অক্টোবর চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনুতে কলকাতা পুরসভার পার্কে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৩ ফুট দীর্ঘ ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এম কে নারায়ণ একথা বলেন। তিনি বলেন, সাহস আর স্বদেশপ্রেম তাঁর জীবনকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা অনুসরণ করার তাগিদ রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, দেশের সর্বত্র আজ মূল্যহীনতা দুর্নীতি এবং হিংসা যেভাবে বাড়ছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্যে সর্দার প্যাটেলের কথা মনে রাখতে হবে। বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন বলেন, সর্দার প্যাটেলের আদর্শ সকলের কাছে প্রেরণাদায়ী। মেয়র পরিষদ সদস্য দেবাশিস কুমার বলেন, সর্দার প্যাটেলের নামে নগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামকরণের প্রস্তাবও আমাদের কাছে এসেছে। আমরা এই প্রস্তাবে সম্মত। সর্দার প্যাটেলের এই মূর্তিটি তৈরি করেছেন ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি বি এল জৈন। মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

আমরা হিন্দুই : রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে আন্তঃ পরম্পরা আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''সারাদেশের যুবসমাজ এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বাভিমান জাগরণ ব্যতিরেকে দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে আর এস এস দীর্ঘদিন ধরে একাজ করে চলেছে। হিন্দুধর্মের সকল মত-পথের মঠ-মন্দির একত্রিত হওয়া ও সংগঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক ভিটে ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে এই আন্তঃ পরম্পরার (মঠ-মিশন) পারস্পরিক আলোচনাসভার আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং আবশ্যিক।'' গত ২৩ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত দেবানন্দ ব্রহ্মচারী। ছবি : বাসুদেব পাল

প্রবীণ সন্ন্যাসী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর সদস্য ও রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মের ১৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হয় এই সভা। দু'দিন ব্যাপী এই আলোচনাসভার (Intra Faith Dialogue) সূত্রপাত করে স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ির ভারপ্রাপ্ত স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ। তিনি আলোচনা সফল করার জন্য শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রবীন মিত্র এবং অন্য সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ প্রভানন্দ মহারাজ আলোচনার উদ্বোধন করে বলেন— এদেশে হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা ও আচরণ জীবনপদ্ধতির বিকাশ হয়েছে। হিন্দু নাম কালক্রমে এলেও একে বদল করা যাবে না। আমরা হিন্দুই।

প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেনও ভাষণ দেন।

শ্রীমৎ দেবানন্দ মহারাজ বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁরা তাঁদের মঠে-আশ্রমে আহ্বান জানান। স্বামীজীরা যান। তবে মিশনের পক্ষ থেকে অন্যদের কদাচিৎ ডাকা হয়। পরস্পর মেলামেশা হলে ভালো। বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিশন অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বাগবাজার ফণিভূষণ যাত্রামঞ্চে সভা পরিচালনা করেন বেলুড় বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং ধন্যবাদ দেন স্বামী সত্যপ্রিয়ানন্দ মহারাজ। চৌদ্দটি মঠ-মিশনকে অনুষ্ঠানে আহ্বান জানানো হয়েছিল। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বন্দুগৌরব ব্রহ্মচারী, কিংকর শ্যামানন্দ, ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, স্বামী অশোকানন্দ, বেলুড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস কাঠিয়াবাবা প্রমুখ।

স্বস্তিকা'য় আয়োজিত লেখক সম্মেলন

লেখক সম্মেলনে নৃপেন আচার্য, দীনেশ সিংহ, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় আঢ্য ও নবকুমার ভট্টাচার্য (বাঁ দিক থেকে)

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৪ সেপ্টেম্বর স্বস্তিকা পত্রিকা'র নিজ ভবনে আয়োজিত হলো এক লেখক সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্টার দীনেশ চন্দ্র সিংহ। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিশিষ্ট লেখক ও প্রবাসী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য। অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা'র পুজো সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দীনেশচন্দ্র সিংহ। তাঁর হাতে স্বস্তিকা তুলে দেন পত্রিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য। স্বস্তিকা'র প্রকাশক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব-ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, ''রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বস্তিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। আজ সেকুলারিজিমের অর্থ দাঁড়িয়েছে হিন্দুর নিন্দা ও মুসলমান তোষণ। এর সার্থক ব্যতিক্রম হলো স্বস্তিকা। মা সরস্বতীর বরপুত্র হলেন লেখকেরা। এঁরা স্বস্তিকা'কে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করছেন।'' সভাপতির ভাষণে দীনেশ চন্দ্র সিংহ বলেন, ''স্বস্তিকা'র লেখকের গণ্ডী আরও বেশি প্রসারিত করা দরকার। বিগত শাসক জমানায় রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ থাকায় স্বস্তিকা প্রচারে লুকোছাপা হোত।'' সেই ভয়ের পরিবেশ এখন কেটে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, ''হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠনের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাদেরও স্বস্তিকা'র প্রচারে উদ্যোগী হওয়া দরকার।'' নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য স্বস্তিকা'য় পাঠকদের চিঠিপত্র আসার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক-লেখিকাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পুজোসংখ্যার ঔপন্যাসিক শ্রীরামপুর কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান সৌমিত্র শংকর দাশগুপ্ত এবং ঔপন্যাসিকা সুমিত্রা ঘোষ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, গল্প-লেখক গোপাল চক্রবর্তী, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গুরুপদ শাণ্ডিল্য ও নিখিলেশ গুহ, গবেষক সুখেন্দু বাউরি, স্বস্তিকা'র জনপ্রিয় কলম 'রাজ্য-রাজনীতির' লেখক নিশাকর সোম, মেয়েদের কলম 'অঙ্গনা'র লেখিকা ইন্দিরা রায়, বিশিষ্ট লেখক ও অধুনা শ্যামাপ্রসাদের জীবনী রচনায় রত তথাগত রায়, বিজ্ঞানী জিষ্ণু বসু ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন, তারক সাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাশীষ রায়চৌধুরী, দেবাদিত্য চক্রবর্তী, পীতারুণ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ দে, রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক, এন সি দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন স্বস্তিকা পত্রিকা'র দুই সহ-সম্পাদক বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। নবকুমার ভট্টাচার্য লিখিত 'বিচিত্র পেশা, বিচিত্র পরম্পরা' গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দীনেশ চন্দ্র সিংহ।

অন্তর্দলীয় সংকটে রাজ্যের শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই

নিশাকর সোম

রাজ্যের দুটি পক্ষ অর্থাৎ শাসক ও বিরোধীরা নিজেদের অন্তর্দলীয় সমস্যা এবং সংকটে পড়ে গেছে। প্রথমেই সিপিএমের অবস্থাটা দেখা যাক। সিপিএমের রাজ্য-নেতাদের লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য-নেতাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ। রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হাওড়া জেলার প্রাক্তনী দীপক দাশগুপ্তের মতে পার্টি কোনওদিনই সংগ্রামী (বিপ্লবী) হিসাবে গড়ে ওঠেনি। দীপকবাবুর বক্তব্যের লক্ষ্য হলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দীপকবাবু কি ভুলে গেলেন সাত-এর দশকে সালকিয়া প্লেনাম থেকেই বিদায়ী সাধারণ-সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়ার কৃষিবিপ্লবের দলিল বাতিল করে হিন্দি বলয়ে পার্টির বিস্তৃতি বাড়ানোর সিদ্ধান্তের মধ্যেই সংসদীয় পথকে আঁকড়ে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাতে দীপক দাশগুপ্তেরও সমর্থন ছিল। দীপকবাবুর দায়িত্ব ছিল— মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার পার্টি সংগঠন দেখার। এই জেলাগুলিতে নেতারা সংগ্রামী পার্টি তো দূরস্থান জেলাপার্টির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব- এর শরিক হয়েছিলেন। সিপিএম-এর অন্যতম নেতা গৌতম দেব বলেছেন যে, পার্টির পরিধির বাইরেও বামপন্থী আছেন— তাঁদেরকে মান্যতা দিতে হবে এবং তাঁদের রাজ্য-রাজনীতিতে ও আঞ্চলিক পার্টির পরিধিতে আনতে হবে। গৌতম দেব যতই বলুন না কেন, পার্টির মধ্যে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে। পার্টির রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক যেমন দীপক দাশগুপ্তকে কার্যত কোনও জেলা ডাকে না।

রাজ্য-পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী পার্টির নেতৃত্বের সমালোচনা করে লিখেছেন, আত্মপরিচিতি বা জনজাতি বা ধর্মসম্প্রদায় অথবা নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করছে, তার মধ্যে অনেকগুলি দাবির যথার্থতা আছে শুধুমাত্র শ্রেণী সংগ্রামই একমাত্র পথ নয়, যেসব গণতান্ত্রিক উপাদানগুলি আছে। তার প্রতিও মনোযোগ দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

নেতৃত্বকে তীব্র কষাঘাত করে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুকোমল সেন (বেণু) লিখেছেন—আপটেড পার্টিকর্মসূচীতে সব সময়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা আছে। বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে এই লক্ষ্যকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পার্টির রাজ্য-নেতৃত্ব শুধুমাত্র শিল্পায়নকে জোর দিয়েছে। পার্টিকর্মসূচীতে বর্ণিত শ্রমিক-কৃষক স্বার্থকে বিঘ্নিত করা হয়েছে। সুকোমলবাবু লিখেছেন— ''পার্টির নতুন সদস্যরা তো বটেই, পার্টির পুরাতন সদস্যদের মধ্যে অনেকেই পার্টির সংবিধানে প্রথমেই যে লক্ষ্য হিসাবে কী ঘোষিত হয়েছে— তা ঠিকমতো খবর রাখে না।'' পার্টির এই লক্ষ্যের বিরোধিতা করে ধর্মঘটের বিরোধিতা করা যায় কি? ইঙ্গিতটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ধর্মঘট- বিরোধী মনোভাবের দিকে।

এ প্রসঙ্গে দীপক দাশগুপ্ত লিখেছেন— বহু নেতা-কর্মীদের মধ্যে কমিউনিস্ট চেতনা তো দূরের কথা, এমনকী অনেকের মধ্যে বামপন্থী চেতনাও নেই।

শুধু লেখাই নয়, সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে তীব্র দলাদলি হচ্ছে। বুদ্ধবাবু সমালোচনায় ভয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরো সভাতে যাচ্ছেন না। সম্পাদকমণ্ডলীতে সিদ্ধান্ত করে গৌতম দেব ও রেজ্জাক মোল্লার 'মুখবন্ধ' করেছে।

নিচের দিকের বহু পার্টি সদস্য পার্টিসম্মেলনে যোগ দেবেন না। তাঁদের বক্তব্য, 'নীতির লড়াই চাই— নেতার লড়াই চাই না।' সিপিএম আজ সাংগঠনিক রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত।

সিপিএম আর এক ধাক্কা পেয়েছে— লক্ষ্মণ শেঠের মেডিক্যাল ডেন্টাল কলেজ নিয়ে বস্তুত প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। কিন্তু মজার কথা হলো, রাজ্য-তৃণমূলের মন্ত্রিসভার সদস্য মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র তাঁর পুত্রকে সাড়ে কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়ে লক্ষ্মণ শেঠের কলেজে ভর্তি করেছেন।

বতমান রাজ্য-মন্ত্রিসভার সামনে সমস্যাগুলি হলো— (১) মাওবাদী সমস্যা— এই সমস্যা। মাওবাদী বন্দীদের মুক্তি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীসহ ২৬ জন বুদ্ধিজীবী মমতার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করেছে। এই অভিযোগ মাওবাদী দল এবং তাদের আশ্রিত 'গণসংগঠন' গুলিও মমতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

(২) দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি নাকি অর্পিতা ঘোষকে বলেছেন, ''তোমাকে এবার দিল্লিতে নিয়ে যাবো।''

(৩) বিদ্যুৎ সঙ্কট— কয়লা না পাওয়ার জন্য এই সঙ্কট বিদ্যুতের মাশুল বাড়তে চলেছে।

(৪) বিভিন্ন কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হতে পারে? প্রধানমন্ত্রী তো শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরোধী। এদিকে তৃণমূলী শ্রমিক সংগঠন সহ সকল শ্রমিকসংগঠন ধর্মঘট করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

(৫) রাজ্য-সরকার আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। বুদ্ধবাবুদের কীর্তি সহ বর্তমান সরকারের 'দিশাহীন' নীতি একথা বারংবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।

(৬) দার্জিলিঙের সমস্যা। দার্জিলিঙে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি সভা তো মোর্চার সভায় পরিণত হয়েছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। গোর্খাল্যান্ডের নামে স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।

আজ এ-রাজ্যে দুই পক্ষের সঙ্কটের ছায়া রাজ্যের রাজনীতি অর্থনীতি পড়েছে। যন্ত্রণা ভোগ করছেন রাজ্যের জনগণ। জনগণ জর্জরিত হচ্ছেন মূল্যবৃদ্ধিতে।

কলকাতার বেশিরভাগ নতুন সংবাদপত্রই চিটফাণ্ডের টাকায় চলছে

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাওবাদীদের বন্দুক ফেলে দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল স্রোতে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এর জন্য তিনি মাওবাদীদের সাতদিন সময়ও দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা সাড়া দেয়নি। কারণ, উগ্র কম্যুনিস্টরা গণতন্ত্রে আস্থা রাখে না। অহিংসা নয়, হিংসা, সন্ত্রাসের মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই তাদের মতবাদ। মাওবাদীরা বিশ্বাস করে বন্দুকের নল (পড়ুন গুলি) রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয়। তারা বিশ্বাস করে দেশের মানুষজন নয়, পার্টির দলতন্ত্রই শেষ কথা বলবে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় স্ট্যালিন এবং লালচীনে মাও জে দং দলতন্ত্র কায়েম করতে বেশ কয়েক কোটি নিরস্ত্র প্রতিবাদী মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এইসব নরঘাতক কম্যুনিস্ট-নেতারা কীভাবে আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হতে পারে তা' বোঝা যায় না। মমতা সঠিকভাবেই দক্ষিণবঙ্গের মাওবাদীদের 'সুপারি কিলার' বলে চিহ্নিত করেছেন। এরা ভিন্ন রাজ্য থেকে পেশাদার খুনিদের নিয়ে এসে অহিংস, নিরস্ত্র, একক প্রতিবাদী মানুষকে হত্যা করে। মাওবাদের নামে নরহত্যাকে যদি রাজনীতি বলতে হয় তবে মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়াদেরও রাষ্ট্রনেতা বলতে হবে! মাওবাদী এবং মাফিয়া এই দুই পক্ষই মানুষের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে তোলা আদায় করে। আপত্তি জানালে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাই তথাকথিত মাওবাদীরা আদতে 'গ্যাং অফ ক্রিমিন্যালস্' ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সত্তরের দশকে নকশালপন্থীদের হিংসার জবাব পুলিশ-প্রশাসন হিংসা দিয়েই দিয়েছিল। তখন এক শ্রেণীর তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী একে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে বলে বিস্তর শোরগোল করতেন। অথচ নকশালরা প্রতিদিন অসংখ্য মানুষকে হত্যা করতো তার প্রতিবাদ তখন কাউকে করতে

গূঢ়পুরুষের

কলম

দেখিনি। বুদ্ধিজীবীদের এই দ্বিচারিতা আজও চলছে। কলকাতায় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা এইসব বুদ্ধিজীবী কলমবাজ জানেন যে জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছে। সেখানে বন্দুকই শেষ কথা বলে।

সংবাদমাধ্যমে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে ছত্তিশগড় রাজ্যে এবং দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলে মাওবাদী দমনের নামে যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। নারীর ইজ্জত নিচ্ছে। ধরে নিচ্ছি যে অভিযোগ সত্য। তার পরেও একটা প্রশ্ন থাকে যে মাওবাদী সশস্ত্র ঘাতকের দল কী সেখানে অত্যাচার করে না? কীভাবে অস্বীকার করা যাবে যে এই মাওবাদীরাই সর্বপ্রথম খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস কায়েম করেছে। তখন সংবাদমাধ্যম সেই অত্যাচার সন্ত্রাসের কথা তুলে ধরেনি। কেন আমরা স্বীকার করছি না যে জঙ্গলমহলের গ্রামে গ্রামে মাওবাদীদের এজেন্টরা ভালমানুষটি সেজে বসে আছে। গ্রামের মানুষ এইসব এজেন্টদের চেনে, জানে। তবু প্রাণের ভয়ে তাদের চিহ্নিত করে না। এই সত্যটি কোন স্বার্থরক্ষায় সংবাদমাধ্যম গোপন করে রাখে সে ব্যাপারে সচেতন নাগরিকদের মুখ খোলার সময় এখন এসেছে। স্পষ্ট বলতে হবে কম্যুনিজম এবং মোল্লাতন্ত্র দুই-ই ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। এই দুই মতবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার দায় সংবাদমাধ্যমকেই নিতে হবে। আন্না হাজারে, লালকৃষ্ণ আদবানি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত জনমত গড়ে তুলেছেন। সারা দেশ আজ তাঁদের পাশে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই জনমত গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সংবাদমাধ্যমের। সেই দায়িত্ব সংবাদমাধ্যম পালন করেনি। উল্টে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়তে পথ পরিক্রমাকে সংবাদমাধ্যম 'সার্কাস' বলেছে। নরেন্দ্র মোদীর 'সদ্‌ভাবনা মঞ্চ'-এ অনশন করাকে নাটক বলা হচ্ছে। এর কারণ, দুর্নীতির ঘুণপোকা ভারতের সংবাদমাধ্যমে প্রবেশ করেছে বিপুলভাবে। সংবাদমাধ্যমে 'পেড নিউজ' এবং 'নিউজ'-এর পার্থক্য করা যায় না। জাতীয় সংবাদপত্রে, টিভি চ্যানেলে এখন কালো টাকার রমরমা। কলকাতার নবাগত অধিকাংশ সংবাদপত্রই চিট ফান্ডের অবৈধ টাকায় চলছে। সকলেই জানে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন বলে শুনিনি। বুদ্ধিজীবীরা বলেন না, কারণ টিভি চ্যানেলে তাঁদের গালভরা কথাবার্তা বলাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পাঠ স্কুলপাঠ্যেও থাকা দরকার

সাধন কুমার পাল

এ রাজ্যের বিপর্যয়ের ইতিহাসে গত ১৮ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যেবেলাটা আতঙ্কের সন্ধ্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ষাট-পয়ষট্টির বয়স্কদেরও বলতে শোনা গেছে যে তারা তাদের জীবৎকালে এত বড় ভূমিকম্প দেখেননি। পরিসংখ্যান বলছে ১৮৯৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ দেশে মোট পাঁচটি ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে যাদের কম্পন মাত্রা ছিল ৮ বা তারও বেশি। এই তিপ্পান্নটি বছর ভূমিকম্পের মূল কারণ ছিল ইন্ডিয়ান প্লেটের সক্রিয় হয়ে উঠা। এর পর মাঝের ৫০টি বছর এই প্লেট এতটা সক্রিয় ছিল না। কিন্তু ২০০১ সালে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে গুজরাটের ভুজ তছনছ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ৫০টি বছর ঘুমিয়ে থাকার পর আবার ইন্ডিয়ান প্লেটের সক্রিয় হয়ে ওঠাই ভুজের ভয়ংকর ভূমিকম্পের কারণ। গত ১৫ বছর ধরে সংঘটিত পৃথিবীর বড় বড় ২০টি ভূমিকম্পের হিসেব নিলে দেখা যাবে প্রতি ৫টি ভূমিকম্পের ১টি হয়েছে ভারতে। শুধু তাই নয় দুটো বড় মাপের বিপর্যয়ের মধ্যে ব্যবধানও ক্রমশ কমে আসছে। সিসমিক জোন ম্যাপ অনুসারে দেশের ৬০ শতাংশ অঞ্চলই ভূকম্প প্রবণ।

এই সমস্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা বোধহয় বলা যায় যে ভারত ক্রমশই ইরান, আফগানিস্থান, আলজিরিয়া বা জাপানের মতো পৃথিবীর কম্পন প্রবণ দেশগুলির পাশে স্থান করে নিচ্ছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে গত ১৮ সেপ্টেম্বরের ভূমিকম্প অনাগত বড় বিপর্যয়ের ইঙ্গিত মাত্র। স্থানীয় ভাবে বিচার করতে গেলে এই ধরনের বিপর্যয়ে এ রাজ্যের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। কারণ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক জোন ফাইভ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ভূমিকম্প ছাড়াও এদেশে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় নিয়ম করেই ঘটে। ভারতের মোট পঁয়ত্রিশটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে বাইশটিই বিপর্যয় প্রবণ। এই বাইশটির মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের প্রায় ৬৮ শতাংশ চাষযোগ্য এলাকা খরা প্রবণ, ৪ শতাংশ এলাকা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ। একটি হিসেব বলছে ১৯৯০-২০০০ পর্যন্ত ভারতে প্রতি বছর গড়ে ৪৩৪৪ জন মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ৩০ মিলিয়ন মানুষ।

সিকিমের সাম্প্রতিকতম ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের ঠাঁই মিলেছে বিধ্বস্ত বাড়ির ছাদেই।

এই সমস্ত বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা মানুষের নেই। কিন্তু বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সচেতন থাকলে ক্ষয়ক্ষতি/প্রাণহানি অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়। এই ভাবনাকে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মতো বিপর্যয় মোকাবিলায় মূলত দুভাবে এগোতে চাইছে। এক, দেশে বিপর্যয় সচেতন প্রশাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারা গড়ে তোলা।

এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা, ব্লকস্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পৃথক দপ্তর গড়া ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ইউ এন ডি পি ও রাজ্য ত্রাণ বিভাগের উদ্যোগে গ্রামপঞ্চায়েত, পৌরসভা, ব্লক ও জেলাস্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা তৈরি করা, বিপর্যয় মোকাবিলা দল গড়ে তোলা ও জনসচেতনতা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

দুই, দেশজুড়ে স্কুলপাঠ্য বিষয় হিসেবে বিপর্যয় মোকাবিলাকে চালু করা। কারণ যে কোনও বিপর্যয়ে শিশু-কিশোরদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনাই বেশি থাকে। ২০০৪-এর তামিলনাড়ুর একটি স্কুলে অগ্নিকাণ্ডে ৮৩ জন শিশুর মৃত্যু বা ১৯৮৪-এর ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ে এবং ১৯৯৯-এর সুপার সাইক্লোন, ভুজ-লাতুরের ভূমিকম্প বা ২০০৪-এর সুনামীর মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। স্কুল পাঠ্যসূচীতে বিপর্যয় মোকাবিলা থাকলে পড়ুয়ারা নিজেরা যেমন সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন হবে তেমনি ওরা নিজেদের পরিবারের বড়দেরও এ ব্যাপারে সহজেই প্রভাবিত করতে

পারবে।

বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অগ্নিকাণ্ড, জঙ্গিহানা, পথ দুর্ঘটনার মতো মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের আগে, বিপর্যয় চলাকালীন ও বিপর্যয়ের পরে করণীয় ও অকরণীয় কাজগুলি সম্পর্কে মানুষকে আত্মস্থ করানো এবং ব্যবহারিক জীবনে সেগুলির প্রতিফলন ঘটানোর কাজটি বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। এই বিষয়গুলি স্কুল- পড়ুয়া কচিকাঁচাদের মনে একবার গেঁথে দিতে পারলে তা যে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের জন্য লাভদায়ক হবে তা-ই নয় বর্তমান সময়েও ফল দেবে এমন প্রচুর উদাহরণ আছে।

২০০৪-এর সুনামির পর এরকম একটি ঘটনা নিয়ে খবর করেছিল বৃটেনের বিখ্যাত সান পত্রিকা। আট বছরের টিলি মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল তাইল্যান্ডের ফুকেট দ্বীপে। শ্রেণীতে সে তার শিক্ষকের মুখে শুনেছিল সুনামি আসার পূর্ব মুহূর্তে সমুদ্র কেমন আচরণ করে। ২৬ ডিসেম্বর সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে সমুদ্রের গতিবিধি দেখে তার সন্দেহ হয়। তার মাকে সে সমুদ্রের অস্বাভাবিক আচরণ দেখিয়ে সম্ভাব্য সুনামি সম্পর্কে অবহিত করে। শিশু বলে টিলির বক্তব্য উপেক্ষা না করে ওর মা নিরাপদ স্থানের দিকে ছুটতে ছুটতে অন্যদেরও সতর্ক করে তোলে। ছোট্ট টিলির স্কুলের শিক্ষা ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য সেদিন শুধুমাত্র সে নিজেই বাঁচেনি, মায়খাও বিচ সংলগ্ন কয়েক'শ পর্যটকের প্রাণও বেঁচে যায়।

এই ভাবনা মাথায় নিয়ে সি বি এস সি ২০০৩ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা পাঠ্যসূচীভুক্ত বিষয় হিসেবে অষ্টম শ্রেণী থেকে পড়াতে শুরু করে। পরের বছর নবম ও তার পরের বছর (২০০৫) দশম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৪-এর শেষে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সুনামির পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলিকে বিপর্যয় মোকাবিলা একটি স্কুলপাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ দেয়। বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে ভাবনার আশ্বাস দিলেও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এই প্রস্তাবটি পত্রপাঠ বাতিল করে দেয়। বলা হয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে সরকার ছাত্রছাত্রীদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে চায় না।

তবে দেরিতে হলেও ২০০৯-এর জুলাই মাসে দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশ বিপর্যয় মোকাবিলা স্কুলপাঠ্য বিষয় হিসেবে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু করে, পরের বছর অষ্টম, এরকম করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। চলতি বছরের (২০১১) ২৫ জুন নীতিশ কুমার বিহারের স্কুলগুলিতে পাঠ্যবিষয় হিসেবে বিপর্যয় মোকাবিলা অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়।

বিপর্যয়প্রবণ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও বিগত পাঁচ দশক ধরে এখানে জাতীয় বিপর্যয়ের মতো বড় কোনও বিপর্যয় হয়নি বলেই হয়তো সেদিন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে পাঠ্য-বিষয় হিসেবে বিপর্যয় মোকাবিলা বোঝা মনে হয়েছিল। কিন্তু গত ১৮ অক্টোবরের ভূমিকম্প এরাজ্যের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মানুষকে যেভাবে নড়িয়ে দিয়ে গেছে এবং বিশেষজ্ঞরা যেভাবে আরও বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তাতে এখন স্কুলপাঠ্য বিষয় হিসেবে বিপর্যয় মোকাবিলা না থাকাটাই হবে আশ্চর্যের।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের গুজবে পড়ুয়ারা শেণী কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত। এই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা সম্পর্কে শুধু মাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, গুজবে কান না দিয়ে কিভাবে শান্ত থাকা যায়, প্রকৃত বিপর্যয়ের সময় কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, শ্রেণী কক্ষ ছাড়তে হয়, নিজে অক্ষত থেকে কিভাবে অন্যকে উদ্ধার করতে হয় এসব ব্যাপারে স্কুলে নিয়মিত মকড্রিল হওয়া দরকার।

সব মিলে বলা যায় সিলেবাসের বোঝা বাড়বে শুধু মাত্র এই যুক্তিতে স্কুলপাঠ্য বিষয় হিসেবে বিপর্যয় মোকাবিলাকে পড়ুয়াদের নাগালের বাইরে রাখলে ভবিষ্যতে সুকুমার রায়ের বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই-এর মতো এরাজ্যের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানদের চড়া মূল্য দিতে হতে পারে।

সার্বিক শান্তি : পশ্চিমী নেতৃত্বের কোমল রূপ

অতিথি কলম

রাম মাধব

[বিশ্ব চার্চ পর্ষদ (World Council of Churches বা সংক্ষেপে ডব্লু সি সি) হলো শত শত চার্চ সংগঠনের জেনেভাস্থিত এক শক্তিশালী সংগঠন। সারা বিশ্বে চার্চ সংগঠনগুলির ওপর এর গুরুত্ব এবং প্রভাব অপরিসীম। এই সংস্থাটি গত ১৭ থেকে ২৪ মে অবধি বিশ্বব্যাপী চার্চ সংগঠনগুলির এক সম্মেলনের আয়োজন করে কিংসটন, জামাইকাতে। এই সম্মেলনের শিরোনাম ছিল "An Ecuminical Call to just peace"।

উপরোক্ত সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে আহ্বান জানায় ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে। হিন্দু সংগঠনের পক্ষে রাম মাধব ওই সম্মেলনে যোগ দেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও সুরিনাম থেকে আগত মুসলমান ও ইহুদি প্রতিনিধিদের সমক্ষে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন গত ২০ মে। সেই বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে উপস্থাপিত হলো।]

আমার পক্ষে এটা খুবই আনন্দের ও সম্মানের যে আমি এই মহান সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। আমি ডব্লু সি সি-র কাছে কৃতজ্ঞ কারণ সংস্থাটি আমাকে এই সুন্দর একটি দেশে আমাকে আহ্বান করেছে যে দেশের সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক সুগভীর।

এটাও খুব আনন্দের যে, বিশ্বে সার্বিক শান্তি স্থাপনে সংস্থাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যদিও এই সম্মেলনটির নাম দেওয়া হয়েছে "An Ecuminical call to just peace"--- প্রাথমিকভাবে এই সম্মেলনে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিশ্বের খৃশ্চান সম্প্রদায়কে। তা সত্ত্বেও ডব্লু সি সি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে এখানে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তা যথার্থ এবং প্রশংসনীয়।

শান্তি এবং সুবিচারের কোনও ধর্ম নেই। বরং দুনিয়া কিছু ধর্ম ইতিহাসে শান্তি নিয়ে যথেচ্ছ ছিনিমিনি খেলেছে এবং এখনও তা করছে। শান্তি হলো এই বিশ্বের মানবজাতির কাছে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা এবং সমগ্র মানবজাতির কাছে এটা হলো সর্বোচ্চ মহৎ লক্ষ্যবস্তু। বাস্তবে আমরা হিন্দুরা শান্তিকে এক স্বর্গীয় বাস্তব সত্তা বলে মনে করি। প্রত্যহ একজন হিন্দুর জীবনে শুরু হয় 'শান্তির প্রার্থনা'র মধ্য দিয়ে। একজন হিন্দুর কাছে শান্তির প্রার্থনা কেবল মানবজাতির জন্য নয় বরং প্রকৃতি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি সকলের জন্যই। দুনিয়ার প্রাণী ও জড়বস্তু সকলের জন্যই শান্তির কামনা। একজন হিন্দুর কাছে 'সার্বিক শান্তি' হলো অন্তর ও বাহিরের।

সার্বিক শান্তির আলোচনার শুরুতে বলতে চাই যে, বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতি শান্তি বলতে কী বোঝে। একই শব্দ বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন অর্থ বহন করে এটা সর্বজনবিদিত। এমন কী যীশুও তাঁর হত্যাকারীদের বলেছিলেন তাঁকে উত্তর দেবার আগে এই শব্দের ব্যাখ্যা তারা দিক।

পশ্চিমে শান্তি (peace) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'pax' থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো চুক্তি, দুই দলের লড়াই থামাতে সমঝোতা বা দুই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত এড়াতে কোনও শর্ত। নেপোলিয়ান একবার বলেছিলেন, 'শান্তি হলো দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে এক অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি।"

কিন্তু হিন্দুদের কাছে শান্তির অর্থ হলো স্বর্গীয়, যা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার এক স্বাভাবিক অবস্থা। তাদের কাছে সুবিচার ব্যতীত শান্তির কোনও অর্থ হয় না। সুবিচার ছাড়া কোনও কিছু দমন করা যায় না। আবার শান্তির নামে কাউকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। সুতরাং হিন্দুদের কাছে সুবিচার আর শান্তি এই দুই শব্দের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

যা ঠিক নয় তা কখনওই শান্তি আনতে পারে না। কিন্তু সুবিচার আক্ষরিক অর্থে রাজনৈতিক। স্থান কাল অবস্থান ভেদে এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন যখন আমেরিকা আফগানিস্তান বা ইরাক আগমন করে তখন তাদের ব্যাখ্যা হলো এই যুদ্ধ শান্তির জন্য। যখন কিছু কোরীয় যুবক আফগানিস্তানে ধর্মান্তকরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ধরা পড়ে তখন তাদের দাবী এই প্রক্রিয়া শান্তির সপক্ষে। আবার যখন জেহাদীরা এই মিশনারীদের অপহরণ করে তাদের কাছে থেকে কথা আদায়ের জন্য তখন এদের যুক্তি শান্তির জন্য তাদের এই অপহরণ।

আসলে এই শান্তি স্থাপনের শব্দটি খুব মহৎ হলেও এর মধ্যে অনেক ত্রুটিও রয়েছে। সার্বিক শান্তির নামে একজন সাম্রাজ্যবাদী, জঙ্গীকে সমর্থন করে, অশান্তিকারীদের পাশে দাঁড়ায়। অতীতে বহুবার দেখা গেছে চার্চ ভুল পথে পরিচালিত হয়ে একনায়কদের পাশে দাঁড়িয়েছে, মানবাধিকারীদের সমর্থন না করে উল্টোটাই করেছে।

বাস্তব সার্বিক শান্তি এই মধুর বচনের মাধ্যমে অনেকে তাদের

'সব ধর্মই শান্তি চায়', 'গণতন্ত্র-ই শান্তির সপক্ষে সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি' ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া কেবল কোনও কাজের কথা নয়। কোনও কোনও ধর্ম কি সংঘাত তৈরি করছে না? আজকের দুনিয়ায় কি জেহাদের ইসলামী চিন্তাধারা যুদ্ধ, হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করছে না? অতীতে বা বর্তমানে মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ কি অশান্তি ডেকে আনেনি? গত শতকে গণতন্ত্র কি তেমন অশান্তির সৃষ্টি করেছে যতটা করেছে কম্যুনিস্ট একনায়কতন্ত্র? যদি বিশ্বায়ন সংঘাত তৈরি করে তেমনি সংরক্ষণবাদ কি গরীবি এবং গৃহযুদ্ধ বাঁধায়নি?

রাজনৈতিক উচ্চাশা, প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। ধর্ম সর্বদা রাজনীতির সীমানার বাইরে থাকা উচিত। আসলে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের আড়ালে রয়েছে চার্চ আর রাজার মধ্যে দ্বৈরথ।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা যেমন এডস, জলাভাব বা গরীবী— এগুলির সমাধানে চার্চে যেমন ভূমিকা সীমাবদ্ধ, তেমন-ই খৃস্টান বা অখৃস্টান দুই ধরনের ভাল মানুষরা সব সময়ে এইসব সমস্যার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং লড়বে। ধর্ম অনুঘটকের কাজ করবে, কিন্তু নেতৃত্ব নয়। সিজারের ভূমিকা যেমন সিজার পালন করবেন, তেমনি খৃস্টের কাজ তিনিই করবেন।

আমরা আশা করতেই পারি যে, সার্বিক শান্তির নামে ধর্মীয় ব্যক্তিরা রাজনীতির প্রাঙ্গণে নেমে পড়বেন না।

হিংসার উৎস সন্ধানে

হিংসার রূপভেদ ব্যাখ্যা করা সহজ। দুর্ভাগ্যক্রমে ডব্লু সি সি দলিলে সন্ত্রাসের মূল উৎস সন্ধানে কোনও প্রয়াসের কথা নেই। হিংসার আজ দুনিয়ার সর্বত্র ঘটে চলেছে। শান্তি সংস্থাপনে হিংসার উৎস কোথায় তা নির্ণয় করতে হবে। না হলে প্রচেষ্টা হিংসা আর সংঘাতের মধ্যে হারিয়ে যাবে।

ইউনেসকোর সংবিধানের মূল কথাই হলো : 'মানুষের মনই হলো হিংসার আঁতুড়ঘর, সুতরাং মানুষের মনেই শান্তির সপক্ষে যুক্তি তৈরি করতে হবে; মানবজাতির ইতিহাসে এটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে একজন অন্যের জীবনধারা, চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচারণ, পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস তৈরি করেছে সংঘাত"। অনেক সংঘাত-ই মানুষের মন সঞ্জাত।

হিংসা, অস্ত্র, হত্যা, অত্যাচার এদের বিভিন্ন স্বরূপ। বাস্তবিক বিংশ শতক ছিল মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি হিংসা, যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। এই শতকেই আমরা দুটো বিশ্বযুদ্ধ লড়েছি, পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বাড়-বাড়ন্ত, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে কোনও দেশকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। এইসব সংঘাতের পিছনে কোনও কারণ খাড়া করা হয়েছে— কখনও তা রাজনৈতিক আবার কখনও ধর্মীয়।

দুনিয়া জুড়ে আরেক ধরনের হিংসা কাজ করছে। অবশ্য তা বাহ্যিক নয়, কিন্তু তা আরও বেশি কঠিন এবং ক্ষতিকর। এগুলি হলো মানসিক এবং আবেগময়। এদের অস্ত্র হলো মিডিয়া, অপপ্রচার। যদি আমি শারীরিক ভাবে আহত হই তাহল একরকম, আবার আমি যদি মানসিকভাবে..., আমার আবেগকে কেউ আঘাত দেয়— যেমন তা যদি হয় আমার পূর্বপুরুষদের মর্যাদা হানিকর, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাসের ওপর আঘাত তবে তা অন্য প্রকারের। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে বিভিন্ন চার্চ আমাদের ধর্মকে আঘাত করছে, অপমান করছে অসত্য, বর্বর বলে।

অপরাধী

কোনও রাখঢাক না করেই হিংসা আর সংঘাতের উৎস সন্ধান করা উচিত। 'সব ধর্মই শান্তি চায়', 'গণতন্ত্র-ই শান্তির সপক্ষে সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি' ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া কেবল কোনও কাজের কথা নয়। কোনও কোনও ধর্ম কি সংঘাত তৈরি করছে না? আজকের দুনিয়ায় কি জেহাদের ইসলামী চিন্তাধারা যুদ্ধ, হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করছে না? অতীতে বা বর্তমানে মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ কি অশান্তি ডেকে আনেনি? গত শতকে গণতন্ত্র কি তেমন অশান্তির সৃষ্টি করেছে যতটা করেছে কম্যুনিস্ট একনায়কতন্ত্র? যদি বিশ্বায়ন সংঘাত তৈরি করে তেমনি সংরক্ষণবাদ কি গরীবি এবং গৃহযুদ্ধ বাঁধায়নি?

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শান্তিলাভ করতে গেলে ধর্ম, রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং আর্থ-সামাজিক তত্ত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সারাবিশ্বে গ্রহণযোগ্য বিশ্ব মতামত গ্রহণ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই, সংঘাত থাকবেই। এটাই তো বিশ্বজনীন তত্ত্ব ভারতে থাকে আমরা ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করি।

যুগের প্রয়োজন ধর্ম

মহাত্মা গান্ধী শান্তির দূত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জুনিয়ার মার্টিন লুথার কিং একবার বলেছিলেন, "মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনে কতগুলি সার্বজনীন নীতি মেনে চলতেন যা দুনিয়ার অন্তরীণ নৈতিক গঠনের তত্ত্ব এবং এই তত্ত্ব অভির্যজ তত্ত্বের মতই ধ্রুব সত্য"।

আজকের সবচেয়ে জরুরী সর্বজনীন অক্ষয় মূল্যবোধকে সর্বজনীন রূপ প্রদান করাই হলো ধর্ম। এই মূলবোধ সর্বধর্ম, জাতি, সমগ্র সমাজ এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। চার্চকে সময়োপযোগী করে বদলাতে হয় সার্বজনীন ধর্মীয় সনাতনী নীতির নিরিখে এবং শান্তির সন্ধানে কিছু তৎপরতা দেখাক চার্চ।

বিশ্ব দর্শনে ধর্ম

আমি হিন্দু মতাদর্শ থেকে কিছু তত্ত্ব চার্চের জন্য তুলে ধরতে চাই যাতে সার্বিক শান্তির লক্ষ্যে তা আত্মকরণ করে। সেগুলি হলো :

(১) ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান : আমরা হিন্দুরা মনে করি ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। যারা এক ঈশ্বর তত্ত্বে বিশ্বাসী তারা দুনিয়াকে দু' ভাগে ভাগ করেছে। তা হলো তাদের তত্ত্বে বিশ্বাসী আর তাদের তত্ত্বে অবিশ্বাসী এই দুই শ্রেণীতে এবং এরা অধিকাংশ মনুষ্যগোষ্ঠীকে ঘৃণা করে এবং মানবতা খতমের চেষ্টা করে।

(২) ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের বিভিন্নতা : ডব্লু সি সি দলিলে ঈশ্বর সৃষ্ট জীবের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চার্চকেও সেই তত্ত্বকে স্বীকার করতে হবে। চার্চের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ এবং সবার আগে তাকে এক তত্ত্বে বিশ্বাসের তত্ত্ব থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। চার্চকে কেবল বহুত্ববাদকে গ্রহণ বা মান্যতা স্বীকার করলেই চলবে না বরং সেইসঙ্গে তাকে শিখতে হবে ধর্মের বিভিন্নতা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে একই সূত্রে বেঁধে ফেলা।

(৩) প্রকৃতি মাতৃসমা : হিন্দুরা প্রকৃতিকে পূজা করে। কিন্তু এক ঈশ্বরবাদীরা মনে করে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টি। চার্চ এই তত্ত্বকে পরিহার করুক এবং প্রকৃতিকে মাতৃসমা কল্পনাকে স্বীকৃতি দিক। মহাত্মা গান্ধী বলতেন, "প্রকৃতি মানুষের জন্যই সৃষ্ট, কিন্তু তার কামনা বা লোভের জন্য নয়"।

(৪) কর্তব্য বাধ্যতামূলক, অধিকারের দাবী নয় : ডব্লু সি সি দলিলে দুনিয়া ব্যাপী মানব অধিকারের সঙ্গে মহিলাদের অধিকার খর্বের জন্য চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ায় মানবতা রক্ষার দায় অধর্মীয় সংস্থার ওপর ন্যস্ত, কারণ এইসব সংস্থা তা রক্ষায় যথেষ্ট সজ্জিত। ধর্মীয় নেতারা মানুষকে প্রশিক্ষিত করবেন তাদের কর্তব্য সম্পর্কে।

এখানে বোধহয় এই বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিভিন্ন ধর্ম-বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষতঃ মহিলাদের অধিকারে খর্ব করতে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে থাকে। চার্চের বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, চার্চ বাইরে থেকে চাপ না দিয়ে ব্যক্তি বিশেষকে তার ধর্মাচরণের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া কারণ তা হলো তার মৌলিক অধিকার এবং তারা যেন নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে অপর ধর্মকে হেয় করায় এবং নিজের ধর্মের উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করতে অযাচিত উপদেশ না দেয়।

শেষ করার আগে গত শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি এখানে যা বলেছেন তা অবশ্যই ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং সেইসঙ্গে তা দুনিয়ার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাথেয়।

চীনা আক্রমণের ৫০ বছর

হেন্ডারসন ব্রুকস্ রিপোর্ট কি অজানাই থেকে যাবে?

রণজিৎ রায়

বিতর্ক আজও আছে। ১৯৬২ সালে ভারত না চীন কে কাকে প্রথম আক্রমণ করেছিল। অথবা দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র হিমালয়ের প্রায় ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় জনমানবহীন এলাকার অধিকারের জন্য এমন এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল কেন? হিমালয়ের সেই পার্বত্য যুদ্ধে ভারতের বীর সেনা বাহিনীর মর্মান্তিক পরাজয়ের জন্য দায়ী কে বা কারা? প্রায় অর্ধশত বছর ধরে এই বিতর্কের কোনও মীমাংসা হয়নি। অথচ এমনটি হওয়ার কথাই নয়। এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চীন যুদ্ধের পরেই ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর তখনকার প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নির্দেশে দুই সদস্যের একটি সামরিক তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কমিটির প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টি হেন্ডারসন ব্রুকস। তাঁকে তদন্তে সাহায্য করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার পি এম ভগৎ। তদন্তের প্রধান বিষয় ছিল চীন যুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কী এবং যুদ্ধের আদেশ আদৌ ছিল কি না। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের শুরুতে ভারত বা চীন কোনও পক্ষই সরকারিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। কোনও পক্ষই যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে বিমান এবং নৌবাহিনিকে তলব করেনি। চীন যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও পরে একতরফাভাবে 'সিজ ফায়ার' ঘোষণা করেছিল। ভারত যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ বিরতি কোনটাই করেনি। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও আন্তর্জাতিক সন্ধি প্রস্তাবও ছিল না। আজও নেই। দুইটি শক্তিধর রাষ্ট্রের সেনা বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণপণ লড়াই লড়ছে। অথচ সরকারিভাবে কোনও পক্ষই যুদ্ধ করছে না। তাই বলছি, সে এক আজব যুদ্ধ। এই আজব যুদ্ধের প্রকৃত সত্য জানতেই নিয়োগ করা হয়েছিল তদন্ত কমিটি। কমিটির প্রধান হেন্ডারসন ব্রুকস রিপোর্ট জমা দেন সরাসরি প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে। যুদ্ধ শেষের এক বছরের মধ্যে। হেন্ডারসনের রিপোর্ট পড়ে নেহরুর চোখ কপালে উঠেছিল। কেন? আজও কেউ জানে না। নেহরু নিজের হাতে রিপোর্টের উপর 'টপ্ সিক্রেট' লিখে নির্দেশ দেন

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে তোলা এই ছবিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে আই এ এফ আধিকারিকরা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। পেছনে এম আই -৪ হেলিকপ্টারটি দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্টটি তালা বন্ধ করে রাখতে। হ্যাঁ, ১৯৬৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নির্দেশে হেন্ডারসন-ব্রুকস- এর রিপোর্ট লুকিয়ে ফেলে ভারত সরকার। আজও সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। এসেছে কংগ্রেস বিরোধী জনতা সরকার। এসেছে বিজেপি-র নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী এন ডি এ সরকার। কিন্তু কোনও অজানা কারণে সব দলের সরকারই ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের হেন্ডারসন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করতে আপত্তি জানিয়েছে। নেহরুর আমল থেকে বর্তমান ইউপিএ সরকার সকলেই সংসদে একই কথা একই সুরে বলেছে। ''জনস্বার্থে এবং ভারতের সীমান্ত সুরক্ষার প্রয়োজনে হেন্ডারসন-ব্রুকস রিপোর্ট সংসদে পেশ করা যাবে না।'' যেমন, ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর লোকসভায় তখনকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াই বি চব্যন বলেছিলেন, ''আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি হেন্ডারসন- ব্রুকস রিপোর্টে যে সব তথ্য আছে তা প্রকাশিত হলে ভারতের শত্রুদের সুবিধা হবে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর মনোবল নষ্ট হবে। সীমান্তে আমাদের সেনা ঘাঁটি সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য শত্রুরা জানতে পারবে। তাই এই রিপোর্ট ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে গোপনই রাখা হবে।'' চব্যন সাহেবের কথার মানে বোঝা যায়। তিনি হিজ মাস্টার্স ভয়েস। প্রভুকে বাঁচাতে তিনি এমন সব কথা বলেছিলেন। চীন যুদ্ধে ভারতীয় সেনার লজ্জাজনক হারের জন্য শুধুই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেনন দায়ী ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরুও তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যদি পদত্যাগ করেন তবে প্রধানমন্ত্রীরও নৈতিক দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু চিরকালই ক্ষমতালিপ্সু নেহরু সাহেব সব দোষ কৃষ্ণমেননের ঘাড়ে চাপিয়ে ভাল মানুষটি সেজে প্রধানমন্ত্রীর কুরশিতে নির্লজ্জের মতো বসে রইলেন।

বিজেপি-র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যসভার সদস্য প্রবীণ সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার হেন্ডারসন রিপোর্ট প্রকাশের জন্য সংসদে সোচ্চার হন। তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ''রাজ্যসভায় বহুবার হেন্ডারসন রিপোর্ট পেশ করার জন্য আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজকে অনুরোধ করেছিলাম। লাভ হয়নি। প্রতিবারই জর্জ একই জবাব দিয়েছে যে জনস্বার্থে ভারত সরকার হেন্ডারসন রিপোর্ট সংসদে পেশ করবে না।'' তবে কী চব্যন এবং

জর্জের টিকি বিশেষ কোনও পরিবারের কাছে বাঁধা ছিল? জানি না। তবে একটা কথা জানা আছে যে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট চিরকাল 'ক্ল্যাসিফায়েড' রাখতে পারে না। আইন বলছে ৩৫ বছর পর্যন্ত রিপোর্ট তালাবন্ধ করে রাখা যায়। তার বেশি নয়। জনস্বার্থের দোহাই দিয়েও নয়। ভারতের নাগরিকদের অর্ধশত বছর পরে জানার অধিকার আছে চীন-ভারত যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম কেন? ইতিহাসকে গোপন করার অধিকার রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের দিল কে? সত্য যতই তিক্ত হোক না কেন তা প্রকাশ করতে এতটা ভয় কেন রাজনীতিকদের। স্বাধীনতার ছয় দশক পার করেও ভারতীয়রা আজও নাবালক? প্রশ্ন উঠবেই। কারণ, বর্তমান ইউ পি এ সরকারও জানিয়ে দিয়েছে যে হেন্ডারসন রিপোর্ট তালা বন্ধই থাকবে। গত বছর ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি সাহেব লোকসভায় বলেছেন, ''হেন্ডারসন-ব্রুকস্ রিপোর্ট কুড নট বি ডিক্ল্যাসিফায়েড বিকজ ইটস্ কনটেন্টস আর একস্ট্রিমলি সেনসিটিভ।''

দিল্লীতে হাতে গোনা গুটিকয়েক মন্ত্রী-আমলা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ কী হেন্ডারসনের চীন-ভারত যুদ্ধের রিপোর্ট পড়েননি? হ্যাঁ, এদের বাইরে অন্তত একজন এই অতি স্পর্শকাতর ও একান্তই গোপনীয় তদন্ত রিপোর্ট পড়েছেন বলে লিখিতভাবে দাবি করেছেন। এই ব্যক্তি হলেন লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকার সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েল। বৃটিশ নাগরিক। চীন যুদ্ধের খবর সংগ্রহে তিনি অরুণাচল থেকে লাদাখের রণাঙ্গন ঘুরেছেন। এরপর ১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর, ''ইন্ডিয়া'স্ চায়না ওয়ার'' বইয়ের ভূমিকায় তিনি দাবি করেন এর সমস্ত তথ্যই তিনি পেয়েছেন হেন্ডারসন-ব্রুকসের তদন্ত রিপোর্টের ফাইল থেকে। কীভাবে একজন বিদেশী সাংবাদিক ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের 'অতি গোপনীয়' ফাইল পড়ে ছিলেন তার ব্যাখ্যা নেভিল দেননি। শুধু বলেছিলেন, দিল্লীর জনৈক প্রভাবশালী কংগ্রেসী মন্ত্রী তাঁকে গোপন ফাইলটি পড়ে দেখার সুযোগ করে দেন। সেই প্রভাবশালী মন্ত্রীটি কে তাই নিয়ে একদা বিস্তর গবেষণা হয়েছে সাংবাদিক মহলে। অধিকাংশের বিশ্বাস ছিল যে এই অন্যায় কর্মটি তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াই বি চব্যন করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণ মেনন যাতে ফের দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হতে না পারেন। চব্যন জানতেন, হেন্ডারসনের রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে লেখা আছে কীভাবে নেহরু— কৃষ্ণ মেনন জুটি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লাল ফৌজের মর্টার মেশিনগানের সামনে ঠেলে দিয়েছিল। শুধু এখানেই এই জুটির অপকর্মের শেষ নয়। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এমন জেনারেলদের দেওয়া হয় যাদের যুদ্ধক্ষেত্রের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তখনকার নেফা এবং বর্তমানে অরুণাচল সেক্টারের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল ব্রিজ মোহন কল। যিনি তাঁর সামরিক জীবনে কোনও যুদ্ধে লড়েননি। লাদাখ- আকসাই চীন সেক্টারে যুদ্ধ পরিচালনা করেন জেনারেল প্রাণনাথ থাপার। তাঁরও যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। চীন যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের দায় যখন নেহরু-মেনন জুটি জেনারেলদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন তখন জেনারেল কল প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি পরে একটি বই লেখেন, 'অ্যান আনটোলড স্টোরি'। জেনারেল কলের বক্তব্য ছিল যে প্রধানমন্ত্রী নেহরুই তাঁকে তলব করে হুকুম দিয়েছিলেন চীনের লালফৌজকে ম্যাকমোহন লাইনের ওপারে হঠিয়ে দিতে। ভারতীয় সেনার যুদ্ধ প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ এমন যুক্তি নেহরু শুনতে চাননি। কল সাহেবের কথা সত্য বলে মেনে নিলেও বলতে হয় যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পরিচালনার দায়িত্ব যখন তাঁর ছিল এবং তিনি যখন জানতেন যে অপ্রস্তুত বাহিনীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাইছেন একজন অসামরিক প্রধানমন্ত্রী তখন প্রতিবাদে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। জেনারেল কল তা করেননি। উল্টে নেফা সেক্টারে মোতায়েন সেনাবাহিনীকে প্রত্যাঘাতের নির্দেশ দেন। বৃটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সাওয়েল তাঁর ইন্ডিয়া'স্ চায়না ওয়ার বইতে হেন্ডারসন ব্রুকসের গোপন রিপোর্ট উল্লেখ করে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, ''১৯৬২ সালে ভারতের পূর্ব সীমান্তে আদৌ কোনও যুদ্ধই হয়নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ সামরিক পরিকল্পনাহীন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে একতরফাভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। সামরিক নিয়মে যখন কোনও সেক্টারে সেনার প্রথম দলটি শত্রুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়ে তখন তাঁদের পিছন থেকে সাহায্য করে প্লেটুনের দ্বিতীয় দলটি। নেফা সেক্টারে সাহায্যকারী এই দ্বিতীয় দলটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল না। থাকলেও তাঁদের ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গরম পোশাক ও রসদ ছিল না। চীনা সেনারা পাহাড়ের উপরের বাঙ্কার থেকে অবিরাম মর্টার ও গ্রেনেড চার্জ করে নিচের ভারতীয় সেনাদের বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। তাই নেফায় যুদ্ধ নয়, একতরফা হামলা হয়েছিল। একতরফা সেনা হত্যা হয়েছিল''। নেভিলের বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না। নেফার বা অরুণাচলের যুদ্ধে চীন নিয়োগ করেছিল ৮০ হাজার সেনা। এই বিপুল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের মাত্র একটি ডিভিসনকে পাঠানো হয়। অর্থাৎ প্রায় ১২ হাজার সেনা। এই ডিভিসনের দায়িত্বে ছিল কমপক্ষে ৫০০ মাইল বিস্তৃত হিমালয়ের অতি দুর্গম পার্বত্য রণাঙ্গনে চীনের লালফৌজের অগ্রগতি রুখে দেওয়ার। এরপরেও যদি একে অসম যুদ্ধ না বলি তবে মিথ্যা বলা হবে। প্রসঙ্গত, একটা কথা বলা দরকার যে এমন একটি অসম, অপ্রস্তুত যুদ্ধেও ভারতীয় সেনা যে অমিত বিক্রমে লড়াই করেছিল বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে তার নজির পাওয়া ভার। নেফা ও লাদাখের যুদ্ধে ভারতীয় সেনা প্রমাণ করে দেয় যে প্রয়োজনে অহিংস ও শান্তিতে বিশ্বাসী ভারতবাসী মাতৃভূমি রক্ষায় কতটা ভয়ঙ্কর লড়াই করতে পারে। লালচীনের জেনারেলরা সেকথা বারংবার স্বীকার করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ১৯৬২-এর চীন যুদ্ধে নেফায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর ষষ্ঠ কুমায়ুন রেজিমেন্ট, চতুর্থ শিখ রেজিমেন্ট, গোর্খা রেজিমেন্ট এবং চতুর্থ ডোগরা রেজিমেন্ট মরণপণ লড়াই করেছিল। এখানে সেই লড়াইয়ের উল্লেখ করছি। ব্যাটল অফ ওয়ালং। অথবা ওয়ালংয়ের শেষ লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে যেমন টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে ব্যাটল অফ লেনিন গ্রামের কথা বলা হয়, তেমনি ভারত-চীন যুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট ছিল ব্যাটল অফ ওয়ালং। নেফার অতি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত এই ওয়ালং গ্রামটি। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রামটির অবস্থান তিব্বত-মায়ানমার-ভারত— এই ত্রিসীমান্তে। এখানেই ১৯৬২ সালের ১৪-১৬ নভেম্বর তিনদিন মরণপণ লড়াই হয়। ওয়ালং সামরিক পোস্টের দায়িত্বে ছিল ষষ্ঠ কুয়ায়ুন রেজিমেন্ট। ১৪ নভেম্বর সকাল ৯-৩০ টায় ওয়ালংয়ের বাঙ্কার ঘিরে ফেলে চিনা ফৌজ। চীনারা পাহাড়ের তিনদিক থেকে অবিরাম মর্টার ও মেশিনগান ফায়ার শুরু করে। সমুদ্রের তরঙ্গের মতোই একের পর এক চীনা সেনাদল ওয়ালং দখলে এগিয়ে আসতে থাকে। বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে অধিকাংশ কুমায়নী সেনাই মৃত্যু বরণ করেন। ইচ্ছা করলে তাঁরা আত্মসমর্পণ করে জীবন রক্ষা করতে পারতেন। করেননি। চীনারা সে সুযোগ দিয়েছিল। জবাবে বাঙ্কারের শেষ জীবিত সৈনিক সুবেদার গোবিন্দ সিং রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে থাকেন। একাই শেষ করে দেন দুটি চীনা মেশিনগান পোস্ট। শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। ঠিক এই সময় এসে পড়ে চতুর্থ ডোগরা রেজিমেন্টের ৩৩ জন সৈনিক। প্রায় দেড় দিন এই ৩৩ জন ডোগরা সৈনিক দুই হাজার চীনা সেনাকে রুখে দেয়। ১৬ নভেম্বর সকালে চতুর্থ শিখ রেজিমেন্টের সিপাহীরা পৌঁছয় ডোগরা সৈনিকদের সাহায্যে। শিখদের সঙ্গে 'রিপ্লেসমেন্ট'

হিসাবে পাঠানো হয় সামান্য কয়েকজন গোর্খাকে। এরপর অবশিষ্ট কুমায়নী সৈনিক এবং শিখ সেনা যুক্তভাবে যে লড়াই করে তার সঙ্গে মহাভারতের যুদ্ধের নারায়ণী সেনার মরণপণ সংগ্রামের তুলনা চলতে পারে। শেষ শিখ সৈনিকটির মৃত্যু হওয়ার পর এগিয়ে আসে গোর্খারা। প্রতি ৫০ জন চীনা ফৌজির বিরুদ্ধে মাত্র একজন গোর্খা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতিল রাইফেল হাতে গোর্খারা মোকাবিলা করে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় চীনা রাইফেল—মেশিনগানের। সেদিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোর্খারা হাতাহাতি লড়াই করেছিল স্রেফ কুকরি আর বেয়নেট সম্বল করে। ওয়ালংয়ের লড়াই সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার এন সি রাউলে লিখেছিলেন— ''সিক্সথ কুমায়ুন ফট অ্যান্ড ফট অ্যান্ট ফট টিল দেয়ার ওয়াজ নাথিং লেফট। শিখস্, কুমায়নীস্, গোর্খাস্, ডোগরাস ফট শোল্ডার টু শোল্ডার টু দ্য বিটার এন্ড।''

১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধ শুরু হয় ২০ অক্টোবর। চলে ২১ নভেম্বর। অর্থাৎ এক মাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে চীন সীমান্তে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। ১৯৬২-র জুনে থাগ-লা রিজে চীনা সেনা সমাবেশ শুরু হয়। এরপর ৮ সেপ্টেম্বর চীনা সেনা ঢোলায় ভারতীয় সামরিক পোস্ট দখল করে। ১১ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাকে সীমান্ত রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০ সেপ্টেম্বর লালফৌজ নামক-চু নদীর দুই তীর নিজেদের দখলে আনে। এরপরেই নেহরুর আমন্ত্রণে ৩ অক্টোবর চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই দিল্লী আসেন। তিনি নেহরুকে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন সীমান্ত সংঘর্ষকে যুদ্ধের স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে না। এরপর ১০ অক্টোবর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৫০ জন সেনা ইয়ামসো—লা এলাকায় টহলে বেরিয়ে আক্রান্ত হয়। চীন দাবি করে তাদের ভূখণ্ডে হামলা চালাতেই ভারতীয় সেনারা প্রবেশ করেছিল। এর থেকেই যুদ্ধের আগুন নেফা থেকে লাদাখ ছড়িয়ে পড়ে। ২১ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে চীন সরকার একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। সাংবাদিক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত মত, চীনের বিরুদ্ধে সীমান্ত যুদ্ধের শুরু হয় ১০ অক্টোবর ইয়ামসো—লা এর ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় রণাঙ্গণে। এখানেই চীনের লালফৌজের এক হাজার সেনাকে প্রথম দফার লড়াইতে রুখে দেয় মাত্র ৫০ জন পাঞ্জাবের শের। এই অসম লড়াইতে ২৫ জন পাঞ্জাব পুত্তর শহিদ হন। উল্টো দিকে মারা যায় ৩৩ জন চীনা সৈনিক। এই সেক্টারে দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার দালভি। আটকে পড়া পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জওয়ানদের উদ্ধারে তিনি তাঁর হাতে থাকা রাজপুত রেজিমেন্টকে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু পাঠাননি। পরে দালভি একটি বই লিখেছিলেন। 'হিমালয়ান ব্লান্ডার'। এই বইতে তিনি লিখেছিলেন, পাহাড়ে যুদ্ধে অনভিজ্ঞ রাজপুত রেজিমেন্টকে জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বিবেকে বেঁধেছিল। সত্যি কী তাই। অথবা অন্য কারণ আছে। ভারতের নাগরিকদের সত্য জানার পূর্ণ অধিকার আছে। এই 'সত্য' লেখা আছে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের তদন্ত রিপোর্টে। যে রিপোর্টটি আজও তালা বন্দি হয়ে আছে। নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের মতোই হেন্ডারসন ব্রুকস রিপোর্ট অজানাই থেকে যাবে কী?

চীন আক্রমণের অর্ধশতাব্দী ও কমিউনিস্টদের নির্লজ্জ ভূমিকা

নিশাকর সোম

১ অক্টোবর, ১৯৪৯। চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও-জে-দং তথা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীন গণ-প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন— ''চীনকে জাগিও না— তা'হলে গোটা পৃথিবীকে তারা নাড়া দেবে।'' (ডোন্ট ওয়েকআপ চায়না, ইফ সি ওয়েকসআপ, সি উইল শেক হোল ওয়ালর্ড)। চীনের ভারত আক্রমণের উপক্রমণিকা লিখতে গিয়ে কথাটা মনে পড়ল।

চীনের এই নয়া 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতা স্তালিন মাও জে দং-কে মস্কো ডেকে পাঠান। সেখানে কার্যত মাও-কে আটক রেখে চীন-সোভিয়েত চুক্তিতে তাঁকে বাধ্য করানো হয়। ১৯৫০-এর মে মাসে ভারতবর্ষ হলো প্রথম একটি অ-সমাজতান্ত্রিক দেশ। চীনের সঙ্গে দূত বিনিময় হলো। ভারত থেকে কে. এম. পানিক্কর-কে চীনে পাঠানো হয় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে। পানিক্করও কমিউনিস্টদের 'বন্ধু' ছিলেন। চীনে ভারতীয় দূতাবাসে বহু কমিউনিস্টের সমাবেশ ঘটেছিল। এর মধ্যে নারায়ণ সেন ছিলেন কমিউনিস্টদের বন্ধু। এরপর থেকেই চীনে কমিউনিস্টদের চিকিৎসার জন্য যাতায়াত শুরু হলো।

চীনাপন্থী

প্রমোদ দাশগুপ্ত *হরেকৃষ্ণ কোঙার* *সুন্দরাইয়া* *বাসবপুন্নাইয়া*

২৯ এপ্রিল ১৯৫৪-এ পঞ্চশীল চুক্তি হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন- লাই-এর ভারতভ্রমণ 'হিন্দি-চীন ভাই ভাই'-এর যুগ। ১৯৫৬-এ চীনে প্রকাশিত নতুন মানচিত্রে লাদাখ-কে চীনের অংশ হিসাবে দেখানো হলো। ১৯৫৬-তে ভারত সফর শেষ করে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই দেশে ফিরে জানালেন ''ভারত সরকার ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিয়েছে''। জেনারেল ম্যাকমোহন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত-চীন সীমান্তরেখা টেনে দিয়েছিলেন। সেটাই ম্যাকমোহন লাইন। চীন ধীরে ধীরে লাদাখ-অঞ্চলে ফরওয়ার্ড পলিসি চালু করলো। লাদাখ-এ তিনজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হলেন।

১৯৫৯ সালে অক্টোবর মাসে চীন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের পারমাণবিক শক্তিধর হিসাবে প্রমাণ দিল। সেই দিনটি ছিল দুর্গাপূজার দশমী। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ৬৪-এ লোয়ার সার্কুলার রোডের প্রাদেশিক অফিসে কমিউনিস্টদের মধ্যে উল্লাস দেখা গেল।

১৯৬২-এর ১৩ অক্টোবর ''কলম্বো সম্মেলন'' যাবার সময়ে নেহরু সাংবাদিকদের বলেছিলেন ''আমি ভারতীয় ফৌজকে চীনের ফৌজকে হটিয়ে দিতে বলেছি।''

১৯৬২-তে চীন অসমের বোমডিলা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। এই পটভূমিতে এ-দেশের কমিউনিস্টদের ভূমিকা দেখা যাক। লাদাখ সীমান্তে চীনের আক্রমণের সময় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিলে ''আলোচনা কর— মীমাংসা করে সীমান্ত সমস্যা'' প্রস্তাব গৃহীত

হয়। এখানে উল্লেখ করতে হয় চীনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ভাল ছিল। যথা— (১) চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পানিক্কর ছিলেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা কেরলের এম. এন. গোবিন্দন নায়ার-এর শ্বশুর। (২) এ-রাজ্যের কমিউনিস্টদের দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য বিনামূল্যে চীন থেকে একটি মুদ্রণ যন্ত্র পাঠানো হয়। (৩) ভারত থেকে চীনে চিকিৎসার জন্য ছাত্র-যুবদের পাঠানো হয়। সেখানে তাঁরা সুস্থ হন এবং চৈনিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত সিপিএম নেতা চিত্তব্রত মজুমদারের এক ভাই দেবব্রত মজুমদার ছিলেন। (৪) কলকাতায় চীনের কনসাল অফিসেও তিনি কাজ করতেন। এছাড়া তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন ছিলেন কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী।

১৯৬২ সালে বোমডিলার পতনের পর এ-রাজ্যের বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ-রাজ্যের কমিউনিস্ট নেতাদের একাংশ আত্মগোপন করে পার্টি চালাতে আরম্ভ করেন। তাঁর নেতৃত্বে থাকেন পৃথ্বীরাজ অর্থাৎ সমর মুখার্জি। অপরদিকে কমিউনিস্টদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ চীনকে আক্রমণকারী হিসাবে ঘোষণা করেন। সোমনাথ লাহিড়ী একটি লিফলেটে লেখেন— ''চীন ভূমিলাভের লোভে ভারতকে আক্রমণ করেছে।'' এর বিরুদ্ধে এ-রাজ্যের গরিষ্ঠসংখ্যক কমিউনিস্ট নেতা বলেন ''চীন আক্রমণকারী নয়, ভারত আক্রমণকারী।'' এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতিহাসগতভাবে দলিল তৈরি করেন গৌতম চ্যাটার্জি। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে ফটোগ্রাফার বারথুমুল-এর মানচিত্র সহকারে ভৌগোলিক তথ্য তৈরি করেন অধ্যাপক সুনীল মুন্সী (ভূগোলের অধ্যাপক)। তিনি দেখান ভারতের অবস্থান সঠিক।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য নিহত হবার পর কমিউনিস্ট পার্টি শহীদ মিনার ময়দানে জনসভা ডাকে। কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে সিদ্ধান্ত হয় জ্যোতি বসু (বিধানসভায় বিরোধী নেতা) হবেন এই সভার মুখ্য বক্তা। কিন্তু সভার দিন সকালে জ্যোতি বসু বক্তৃতা করতে অস্বীকার করেন। তখন সোমনাথ লাহিড়ী বক্তা হিসাবে মনোনীত হন। এই ঘটনার পর পিকিং রেডিওতে বলা হয়— ''জ্যোতি বসু কখনও চীনকে আক্রমণকারী বলেননি।''

উল্লেখ করা যায় যে চীন-এর সমর্থক পার্টির কর্মীরা গোপনে চীনের সপক্ষে প্রচার এবং সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এরাই এম. এন গোবিন্দন নায়ারকে কলকাতা জেলা কমিটির সভায় নাজেহাল করে তাড়িয়ে দেয়। মুসলিম ইনস্টিটিউট-এর সভাতে ডাঙ্গের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে জেনারেল বডি সভা ভেঙে দেয় কলকাতা জেলার মুখ্য নেতারা।

এই ভাবেই চীন-প্রীতির বন্যা বইয়ে দিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত-হরেকৃষ্ণ কোঙার। হরেকৃষ্ণবাবু ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন থেকে ফিরে এসে চীনের নীতি পার্টির বিভিন্ন জেলা কমিটির সভায় প্রচার করতে থাকেন।

এদিকে কলম্বো-প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় 'ভারত-চীন আলোচনা করা দরকার— দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে মীমাংসা হোক।' মজার কথা, জেলখানার বন্দী কমিউনিস্টদের মধ্যে দু'ভাগ হয়। একদল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কলম্বো প্রস্তাবের পক্ষে। অপর দল প্রমোদ দাশগুপ্ত-হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে ভারতবিরোধী নীতির সমর্থন করতে থাকেন। এই সময়েই আবার পিকিং রেডিও 'জ্যোতি বসুকে রানিং ডগ অফ ইমপিরিয়ালইজম' বলে বর্ণনা করে। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা-তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ সদস্য আবদুল হালিম (ইনি স্পিকার ছিলেন না)-এর পুত্র বিপ্লব হালিমের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রনেতা চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নেপাল গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বর্তমানে একজন বাংলার অধ্যাপক কি সব বলতে পারবেন?

এছাড়া অন্ধ্রের নেতা সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নাইয়া, নাগি রেড্ডি ও পুল্লা রেড্ডি চীন-সমর্থক ছিলেন। ১৯৫৯ সালে চীন-বিরোধী কথা এ-রাজ্যের প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনও বলেছিলেন। 'প্রমোদবাবুরা মনে করেছিলেন ১৯৫৯ সালে খাদ্য-আন্দোলন হবে আর সঙ্গে সঙ্গে চীনের আক্রমণ সিংক্রোনাইজ হবে। আর এর ফলে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।' প্রমোদবাবুদের এসব নীতির ফলেই নকশাল আন্দোলনের সৃষ্টি এবং নকশালবাদী মাওবাদী পার্টির জন্ম হয় এবং তার জেরেই আজকের মাওবাদীদের দেখছি। অন্যদিকে সিপিএম পার্টি গঠিত হবার পর সিপিএম-নেতারা উগ্রচীনা নীতি ত্যাগ করেন। চীনও ভারতের সব দলের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখে।

চীন এখন দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ভিয়েতনামের কাছে ভারতের তেল তোলা নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। কখনও সিকিম-কে চীনের অংশ হিসাবে দেখাচ্ছে। ১৯৬২ সালেই ভারত সীমান্তে চীন রাস্তা তৈরি করে ফেলেছিল। পাহাড়ের জন্য 'বিশেষ' সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছেন। মাওবাদীরা চীনের এইসব কাজকে সমর্থন করে। প্রশ্ন হলো— নকশালী কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিও ভারত এবং চীনকে কি একই দৃষ্টিতে বিচার করবে? সিপিআই কি চীনকে নিন্দা করবে? সিপিএম কি নির্বাক থাকবে?

চীন এখন পাকিস্তান-বাংলাদেশেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। চীন আজ বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। ভারতের অবস্থান কোথায়? এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবোধ নেই— তাঁরা আন্তর্জাতিকতার জয়গান গেয়ে চীনা প্রেমে বিভোর।

অন্য রকম

মাতৃভূমির প্রতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অ্যাসোসিয়েশন ফর ইন্ডিয়া'স ডেভেলপমেন্ট (এ আই ডি)-এর নাম ক'জন ভারতবাসী জানেন বা আদৌ কেউ জানেন কি না সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে সংগঠনটা তো খুব একটা কেউকেটা নয় যে তার নাম না জানলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে! কিন্তু যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে (ভারতবর্ষে)— এই চিরকালীন আপ্তবাক্যটির প্রতি নিষ্ঠা রেখেই বলা চলে এ আই ডি নিজেই এক মহাভারত সৃষ্টির পথে অগ্রসরমান, ভারতবর্ষের স্বপ্নে বিভোর হয়েই।

ব্যাপারটা তবে খোলসা করা যাক। আমাদের বহু পরিচিত এন আর আই-এর আসল অর্থ 'নন রেসিডেন্সিয়াল ইন্ডিয়ান' (অনাবাসী ভারতীয়)-কে বিকৃত অ্যাবরিভিয়েশনে অনেকেই 'নন রিলায়েবল ইন্ডিয়ান' (বিশ্বাসযোগ্যতাহীন ভারতীয়) কিংবা 'নন রিটার্নেবল ইন্ডিয়ান' (প্রত্যাবর্তনহীন ভারতীয়) বলে কটাক্ষ করছেন। এই কটাক্ষকারীদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। যাঁরা বিদেশে পড়াশুনো করতে যান, তাঁরা শিক্ষান্তে ক'জন-ই বা স্বদেশে জীবিকার সন্ধানে প্রত্যাবর্তন করেন? বা যাঁরা মোটা মাইনের বহু সুযোগ-সুবিধাযুক্ত চাকরি-বাকরি নিয়ে বিদেশে যান তাঁরাই বা স্বদেশের কতটুকু খোঁজ খবর রাখেন?

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নল জেলায় জনৈক কৃষকের সঙ্গে বরিষ্ঠ এ আই ডি ভলেন্টিয়ার কিরণ ভিস্সা।

আর এই জায়গাতেই মহান ভারতের স্বপ্নে বিভোর এ আই ডি করে চলেছে বেশ কিছু অনন্যসাধারণ কাজ। এ আই ডি-র মেন্টর ডঃ মোহন ভগৎ জানালেন, ''প্রকৃতপক্ষে আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের জন্য কিছু করা, তা সে যত ছোট-ই হোক না কেন। না হলে, অকৃতজ্ঞতার ভাগীদার হব আমরা।'' খুব খাঁটি কথা। কিন্তু সেই কথাকে কাজে পরিণত করবার সৎসাহস আছে ক'জনের? এই ব্যতিক্রমী সত্তারই একজন হলেন রবি কুচিমানচী। যিনি ১৯৯১ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছিলেন আমেরিকায়। আই আই টি-র কৃতী ছাত্র রবির তখনই চোখে লেগেছিল— ভারতবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মকেন্দ্রিকতা। পরবর্তী পর্যায়ে রবি ও তাঁর স্ত্রী অরবিন্দ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এবং তাঁদের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে স্বদেশের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে লাগলেন আর ভারতের তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন বিষয়কে তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টার খামতি রাখলেন না। আর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই স্থাপিত হলো অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট বা এ আই ডি।

সবুরে হলেও তার মেওয়া ফলতে শুরু করে দিয়েছে এতদিনে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মার্কিন প্রবাসী, অধুনা এ আই ডি-র মেন্টর ডঃ ভগৎ তাঁর ভারতবর্ষের জন্য প্রবাসে কাজ শুরু করেছিলেন মাত্র ৬০০ ডলার দিয়ে। স্বপ্ন দেখেছিলেন ৭০০০ মাইল ব্যাপী সপ্তসাগর জুড়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন-কে ছড়িয়ে দেওয়ার।

আজ দু'দশক পরে যখন দেখা যায় মাইক্রো হাইডেল গ্রামীণ বিদ্যুতায়ণ প্রকল্প থেকে শুরু করে জৈবিক কৃষি, গ্রামীণ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় বার্ষিক ১ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পে 'কেরিয়ারের স্বপ্নে বিভোর অনাবাসী ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পর্যন্ত এগিয়ে আসছেন, তখন মনে হয় সেই স্বপ্ন যেন বাস্তব রূপ নিতে শুরু করে দিয়েছে। কিরণ ভিস্সা, অরুণ গোপালন, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্ভীক ভট্টাচার্যরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকার এ আই ডি-র সফল কর্মী। এদের সাফল্যের স্বীকৃতি সম্প্রতি মিলেছে ভারতীয় ক্যাটিগরিতে আন্তর্জার্তিক অবদানের জন্য টাইমস অব্ ইন্ডিয়ার 'সোস্যাল ইমপ্যাক্ট' পুরস্কার জেতায়। তবে দেশবাসী তাঁদের কাজের মূল্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই তাঁদের কাজ সার্থক হবে বলে মনে করছেন এ আই ডি-র কর্মীরা।

সিকিমের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত গ্রামে উত্তরবঙ্গ সেবাভারতীর সেবাকর্ম

ভূকম্প পীড়িতদের সাহায্যার্থে চেক তুলে দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর কার্যকর্তারা।

সংবাদদাতা॥ গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিনাশকারী ভূমিকম্পের পর উত্তরবঙ্গ সেবাভারতীর কার্যকর্তারা সিকিম ও শিলিগুড়ির আশপাশের অঞ্চলে আহতদের সেবার কাজ চালিয়েছেন।

ভূমিকম্পের পরের দিন ১৯ সেপ্টেম্বর থেকেই উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেবাকাজ শুরু করে। প্রথম কর্মসূচি নেওয়া হয় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি অনুধাবন। সে কাজে সামিল হন ৬৩ জন কার্যকর্তা। যাঁদের মধ্যে সিকিম অঞ্চলের ২৫ জন এবং উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলার ৩৮ জন কার্যকর্তা ছিলেন। তাঁরা সরাসরি সিকিমের ৭৪টি গ্রামে ঘুরে ভূমিকম্প-দুর্গতদের খোঁজখবর নেন, সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদান করেন। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করা কঠিন। কার্যকর্তারা বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে অনেক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে সেবার কাজ চালিয়েছেন। সিংগতাম তথা গ্যাংটকে সেবাভারতীর ত্রাণশিবির থেকে বিপন্ন মানুষদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি থেকে আসা এই ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল ২৫০টি ত্রিপল, ১৫০টি কম্বল, ১২ কুইন্টাল আনাজ, ৩০০ লিটার পানীয় জল, ৭টিন খাওয়ার তেল, ৫০ কার্টুন বিস্কুট। এছাড়া ছিল চায়ের পাতা, ওষুধপত্র, টর্চলাইট ইত্যাদি। এসব জিনিস বিতরণ করা হয়েছে, পরেও বিতরণ কাজ চলবে।

সঙ্ঘের কার্যকর্তা দীপক রায় এবং সহ-বিভাগ প্রচারক সমীরণ মাঝির নেতৃত্বে কারাকোটের শিবমন্দির চত্বর পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভূমিকম্পের দরুন ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয় মন্দিরের। গত ৬ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী সেবার হাত বাড়িয়ে দিল বিনোদ কৌশিকের দিকে। ভূমিকম্পে শ্রীকৌশিক একটি পা হারান। তাঁর পিতা রামচন্দ্র কৌশিক ও বিনোদ-পত্নী সরোজ কৌশিকের হাতে অনুদান অর্থ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেবাভারতীর বিশিষ্ট সদস্য কুলছত্রপ্রসাদ অগ্রবাল, অদ্বৈতচরণ দত্ত, সুনীল শাহ, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ।

ভূমিকম্প পীড়িতদের সহায়তার জন্যে উত্তরবঙ্গ সেবাভারতীর পরবর্তী সেবাকর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিকিমের একটি বা দুটি গ্রামের পুনর্বাসন বা পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেওয়া। এজন্যে সিকিম সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। এই গ্রামের ঘরের সঙ্গে মন্দির গুম্ফাও তৈরি হবে। সেইসঙ্গে হবে সিকিমের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়েরও কিছু কিছু মেরামতির কাজ।

টাকা ছাড়াই ফাঁকা আওয়াজে মাও-জুজু দমবে কি ?

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দিদি,

ঝাড়গ্রামের সভায় আপনার বক্তব্য শোনার পরই লিখতে বসেছি চিঠি। আপনি মাওবাদীদের সাতদিন সময় দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এরমধ্যে ঠিক করতে হবে কোন পথে যেতে চায় তারা। শান্তি না রক্ত। অস্ত্র না ছাড়লে আলোচনা নয়। আলোচনার রাস্তা খোলা রাখছে সরকার।

এসব শোনার পর দিদি একটা প্রশ্নই মাথায় এল। সাতদিন সময় তো দিলেন, কিন্তু তারপরও খুনের রাজনীতি চললে কী করবেন সেটা স্পষ্ট করলেন না। আপনি গোপন করতে চাইলেও অনেকেই জানে যে দিল্লিও আপনার এই মনোভাবে খুশি নয়। তারাও স্পষ্ট অবস্থান জানতে চাইছে। জঙ্গলে যৌথবাহিনী রাখবেন কিনা সেটা যে আপনাকে এই মাসের মধ্যেই জানাতে হবে।

আসলে অনেক ব্যাপারেই আপনি স্পষ্ট কথা বলেন না। যদিও নিজেকে স্পষ্টবাদী বলে দাবি করে থাকেন হামেশাই। এই যেমন লোকপাল বিল। এখনও পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে শুনতে পেলাম না আপনি ঠিক কী চান। আন্না নাকি নো আন্না?

যাক অন্য কথায় গিয়ে লাভ নেই। আমরা মাও সমস্যা নিয়েই কথা বলি। আপনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখন থেকেই মাওবাদীদের খুনের রাজনীতি দেখে শুনেও তাদের প্রতি একটা অস্পষ্ট মমতা দেখিয়ে এসেছেন। বলে এসেছেন, মানুষের কষ্ট দেখে ওরা রাজনীতি করছে। আলোচনার মাধ্যমে ওদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। লালগড় যখন উত্তপ্ত হলো তখন মাওবাদী মদতপুষ্ট জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে আপনি গলা মিলিয়েছেন। আপনি এবং আপনার অনুগতরা ছত্রধরের সঙ্গে এক ছাতার তলায় বসেছে, হেঁটেছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর আপনি এখনও স্পষ্ট করতে পারলেন না আপনি ছত্রধরকে মুক্তি দেবেন কিনা। কমিটি বিরোধীনেত্রীর বন্ধু থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু নয়। সরকার গড়েই আপনি মাওদের ছেলেমানুষ ভেবে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেয়েছেন। মধ্যস্থতা কমিটি গড়েছেন আপনার অনুগামী কয়েকজনকে সরকারি কমিটিতে আনার জন্য। কিন্তু কখনও ভেবেছেন কি যে ওই কমিটির সদস্যদের সমস্যা সমাধানে কাজে আসবে এমন মাওবাদী নেতাদের সঙ্গে আদৌ যোগাযোগ আছে কিনা। ক'দিন আগেই ৩০ সেপ্টেম্বর আপনার সেই কমিটির জনা দুই সদস্য জঙ্গলে গিয়েছিলেন আলোচনার জন্য। তাঁরা কথা বলেছেন মাও নেতা আকাশের সঙ্গে। সেখানে মাওবাদীরাও পাল্টা কিছু শর্ত দিয়েছে। আপনার কমিটি মেম্বররা সেইসব শর্ত শুনে ফিরে এসেছেন। সেই শর্তপত্রে সইও করে দিয়েছেন আপনার কমিটির সুজাত ভদ্র, ছোটন দাস। অপরদিকে সই করেছেন মাওবাদীদের কোনও এক রাজ্য কমিটির সম্পাদক আকাশ। কোনও এক রাজ্য কমিটি লিখলাম কারণ, মাওবাদীদের ডেরায় গিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই জানি এমন অনেক রাজ্য কমিটি আছে এরাজ্যের জঙ্গলমহলে। আর তাদের মাথাতেও আছে সুতো বাঁধা। সেই সুতো পৌঁছে গেছে ভিন রাজ্যে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মাওবাদীদের সঙ্গে যোগ রেখেই চলে এখানকার মাও নেতারা। তাদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিই যুদ্ধবিরতি কিংবা অস্ত্র সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ আপনার কমিটির নেতারা তাদের সঙ্গে এমন চুক্তিতে সই করেছেন যেখানে যৌথ বাহিনীর চলাফেরার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ চাওয়া হয়েছে। তারা আবার ৩ অক্টোবর থেকে এক মাসের সময় দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। এবার আপনি এক সপ্তাহের সময় দিলেন। কিন্তু সত্যি করেই বলছি মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডাম, এসব শুকনো কথা বা শুকনো হুমকিতে কাজ হয় না। এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নিতে হবে মনমোহন সিং, চিদম্বরমদের। কেন্দ্রীয় ভাবে শান্তি আলোচনা সম্ভব না হলে মাও সমস্যার থেকে নিস্তার নেই রাজ্যের কিংবা দেশের। আপনি ভাবছেন উন্নয়ন দিয়ে মাও সমস্যার মোকাবিলা করবেন। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, অনুন্নয়নের কারণে মাও সমস্যা বাড়ে কিন্তু উন্নয়ন দিয়েই মাও সমস্যার সম্পূর্ণ মোকাবিলা সম্ভব নয়।

আর আপনি যে উন্নয়ন করবেন বলে স্লোগান শোনাচ্ছেন সেই স্লোগানের সুরটাও ক্লিশে হয়ে গেছে। সকলেই জানে আপনার হাতে টাকা নেই। আপনার কান্নায় কেন্দ্রের চোখে জল আসে না। তারা নিজেদেরই সামলাতে পারছেন না তো আপনাকে দেখবে কী করে? তাই এখন জঙ্গলমহলের মানুষও জানে আপনার ঘোষিত প্রকল্পের বেশিটাই কাগুজে থেকে যাবে। শিলান্যাসের শিলাটাই শুধু পড়ে থাকবে।

আপনি বলেছেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও শালবনিতে চারটি নতুন কলেজ হবে। রামগড়ে পলিটেকনিক কলেজ হবে। জেলায় ৩১টি গার্লস হস্টেল। ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল জেলা হাসপাতালে উন্নীত হবে। এছাড়াও ৮১টি গ্রামে ১৬২ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। শালবনি ও নয়াগ্রামে হবে নতুন স্টেডিয়াম। কয়েকটি ইন্ডোর স্টেডিয়ামও নাকি বানাবেন।

আসলে উন্নয়ন চান আপনি। আর প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করলে আপনার কোনও হুঁশ থাকে না। সদিচ্ছা ভালো কিন্তু সেই ইংরাজি প্রবাদটাও মনে রাখা দরকার। জামা কাটার আগেই মেপে নিতে হয় কাপড় কতটা আছে।

একদিকে যখন রাজ্যের কয়লা কেনার টাকা নেই, বকেয়া মেটানোর সামর্থ্য নেই বলে লোডশেডিংয়ে কাটাতে হচ্ছে রাজ্যকে, তখন কোটি কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা শুনে, হাজার হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি শুনে সবাই হেসেছে। উত্তরবঙ্গের পর জঙ্গলমহলও হেসেছে। দিদি, আপনার সদিচ্ছাটাকে ভালো লাগে বলে সত্যিই খুব খারাপ লাগে অন্যের বাঁকা হাসি দেখে।

আপনি ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। বিভিন্ন কবির কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে মঞ্চে মঞ্চে রূপসী বাংলার কথা বলছেন। সত্যিই এই ক্ষেত্রটা বড় উপেক্ষিত। রূপসী বাংলার সঠিক ব্যবহার হলে এই বাংলাকে উপোসী থাকতে হোত না। কিন্তু কেন্দ্র যে টাকা দিচ্ছে না কী করে হবে? দার্জিলিংকে সুইৎজারল্যান্ড বানানোর কথা দিয়ে বাহবা কুড়িয়ে ফিরেই এবার জঙ্গলমহলের পর্যটন নিয়ে জোয়ার আনতে ঝাড়গ্রাম ও ঝিলিমিলিতে ট্যুরিস্ট স্পট করবেন বলেছেন। কিন্তু টাকা কই?

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

দেশভাগ : গান্ধী ও আজাদ

গত ১৫ আগস্ট ২০১১ তারিখের স্বস্তিকায় প্রকাশিত ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত মহাশয়ের নিবন্ধ 'অখণ্ড ভারতের ভাবনা ও কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ' সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে চাই। প্রথমত লেখক লিখেছেন বৃটিশ গভর্নমেন্টের উস্কানিতে জিন্না পাকিস্তান আন্দোলন চালিয়েছেন। এবং গভর্মেন্টের নীতি ছিল 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল'। এই বক্তব্য ঠিক নয়। ঊনিশ শতকে নিঃসন্দেহে ইংরেজ শাসকদের নীতি ছিল 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল'। কিন্তু লর্ড কার্জন ছিলেন এই নীতির শেষ প্রবক্তা। তাঁর পর থেকে অর্থাৎ লর্ড মিন্টো থেকে নীতি পাল্টায়। ১৯০৯ এর মিন্টো-মর্লে সংস্কার ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার কথা বলা হয়েছে। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের সংস্কারে এই বিষয় শুধু বলা হয়নি। সারা দেশের বিধানসভা এবং কেন্দ্রে লেজিসলেটিভ এসেম্বলি গঠন করে ভারতকে স্বায়ত্ত্বশাসন দেবার পথ সুগম করা হয়েছে। কিছু কিছু বৃটিশ আমলা পাকিস্তান চাইলেও বেশির ভাগ আমলা পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, লর্ড লিনলিথগো, লর্ড ওয়াভেল ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করেছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর শ্রমিকদল কোনও অবস্থাতেই পাকিস্তান দাবি মেনে নেননি। ক্যাবিনেট মিশনও অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিল।

তাহলে কেন পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়া হলো? এর কারণ কংগ্রেস নীতিগত ভাবে পাকিস্তান মেনে নিয়েছিল। ১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' বিষয়ে যে প্রস্তাব নিয়েছিল তাতে ভারত বিভাজনের কথা ছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসার কিছুদিন আগেই কংগ্রেস পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব নিয়েছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়েই কংগ্রেস তথা লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বুঝেছিলেন— জিন্না পাকিস্তান দাবিতে অনড় এবং নেহরু-প্যাটেল পাকিস্তান দাবি নস্যাৎ করার জন্য কঠোর অবস্থান নিচ্ছেন না। অগত্যা তিনি ভারত বিভাজনে মত দিলেন।

ডঃ রক্ষিত লিখেছেন ''নেহরুও বড়লাটের ফাঁদে পা দিয়েছেন''। লেডি মাউন্টব্যাটেনও নেহরুর উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন ভারতবিভাগ মেনে নেবার জন্য। এগুলি গল্প কথা। নেহরু ও কংগ্রেস যেখানে কংগ্রেসের বিভিন্ন সময়ের রেজলিউশনে পাকিস্তান মেনে নিয়েছেন সেখানে মাউন্টব্যাটেনের ফাঁদ পাতা ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের নেহরুর উপর প্রভাব খাটানোর কথা ওঠে না। ঐতিহাসিকরা নেহরুকে বাঁচানোর জন্য এসব কথা লিখেছেন।

গান্ধীর সম্বন্ধেও একই কথা ওঠে। সেই ৭ আগস্ট ৪২ এর রেজলিউশন থেকে কংগ্রেসের যত অধিবেশন হয়েছে সবেতেই গান্ধীর উপস্থিতিতে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ১৯৪৪ সালে জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধী জিন্নার সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন তার মূল কথা ছিল পাকিস্তান মেনে নেওয়া। ডঃ রক্ষিত, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন— তাতে লেখা আছে গান্ধীজী 'হঠাৎ' পাল্টে গিয়ে জুন ১৯৪৭ এর কংগ্রেস রেজলিউশন মেনে নিয়েছেন। খ্যাতিমান ঐতিহাসিক কি করে একথা লিখলেন? গান্ধীরা বরাবর ভারতবিভাগ মেনে নিয়েছেন! ভারতবিভাগ যখন দানা বেঁধেছে— তখন দেশে তীব্র আন্দোলন করেছে হিন্দুমহাসভাসহ অন্য কিছু দল। গান্ধীর বিরুদ্ধে জনতার রোষ উথলে পড়েছে। তখন গা বাঁচানোর জন্য গান্ধী একাধিকবার বলেছেন তিনি পাকিস্তানের বিরোধী এবং আজাদকে জানিয়ে দেন পাকিস্তান যদি হয় তাহলে তা তাঁর 'মৃতদেহের উপর' হবে। তাহলে যখন ভারত বিভাগ হতে চলেছে তখন কেন তিনি আন্দোলন করে মৃত্যু বেছে নিলেন না? মনে রাখতে হবে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় গান্ধী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বলেছিলেন। ইংরেজ যায়নি। আর তিনি কথা মতো আত্মহত্যাও করেননি। জুন ১৯৪৭-এ কংগ্রেস-এর মিটিং-এ তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বিরোধীদের ভারত বিভাজনে মত দিতে রাজী করিয়েছিলেন।

ডঃ রক্ষিত লিখেছেন মৌলানা আজাদ ভারতবিভাগের বিরোধী ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। তাই যদি হয় তবে জুন ১৯৪৭-এর কংগ্রসের মিটিং এ তিনি কেন বিরোধিতা করে ভোট দিলেন না, বা মিটিং ছেড়ে চলে গেলেন না। মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিকেরা আজাদের একটি চাল ধরতে পারেননি। অনেক মুসলমানই ভারত ভাগ চাননি এবং পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন। এতে আহ্লাদিত হবার কারণ নেই। এঁদের হিসাব ছিল অন্য। ভারতভাগ হলে মুসলমানরা ভারতে আরও সংখ্যালঘু হবে, তাদের অস্তিত্ব আরও বিপন্ন হবে। আজাদ ভারতকে মুসলমান রাষ্ট্র করার খোয়াব দেখেছিলেন। মুসলমানরা ভারতে একদম সংখ্যালঘু হলে এই স্বপ্ন সার্থক হওয়া কঠিন। মৌলানা মাওদুদি কবি ইজরায়েলের সঙ্গে তর্ক করে এই কথাই জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজাদের উদ্দেশ্য সাধু ছিল না। মনে রাখতে কংগ্রেসে যে মুসলমানরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের পঞ্চম বাহিনী। এই মুসলিম কংগ্রেসীদের চাপেই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করতে পারেনি। সমস্ত মেনে নিয়েছিল সব সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। যার তাৎপর্য ছিল 'বলকানাইজেশন'। আরেকটা কথা— আজাদ সেপারেট ইলেক্টরেট ছাড়া জিন্নার সব দাবী মেনে নিয়েছিলেন। জিন্নার সব চেয়ে অন্যায্য দাবী ছিল মুসলমানদের জনসংখ্যা ২৬ : ৭৫ হওয়া সত্ত্বেও বিধানসভা, চাকরি সহ সর্বক্ষেত্রে ৫০ : ৫০ দাবি মেনে নেওয়া। আজাদ এটি সমর্থন করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি।

শেষ কথা হলো— গান্ধীর দ্বিমুখী চাল ঐতিহাসিকেরা ধরতে পারেননি। দেশভাগ যখন অপরিহার্য— এবং গান্ধীকে এর জন্য দেশের মানুষ দায়ী করছে এবং তা যথার্থ তখন জনগণকে ও নেতাদের বিভ্রান্ত করার জন্য গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে ওঁরা তাঁকে পাত্তা দেন না, ক্ষমতা দখল করার জন্য ব্যস্ত। যদি এটা তাঁর মনের কথা হয় তাহলে ওঁদের সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত যোগাযোগ রেখেছিলেন কেন? স্বাধীন ভারতের-কে কোন প্রদেশের রাজ্যপাল হবেন, কে মন্ত্রী হবেন এবং কোন দপ্তর পাবেন এ বিষয়ে নেহরু-প্যাটেলদের জানিয়ে ছিলেন কেন? রাজকুমারী অমৃত কাউরকে মন্ত্রী করার জন্য জেদাজেদি করেছিলেন কেন? সবশেষে জুন ১৯৪৭ এর কংগ্রেস মিটিংএ যোগ দিয়েছিলেন কেন? দেশ ভাগ হবার পর রাজনীতি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে সদ্যোজাত পাকিস্তানকে ৫০ কোটি দেবার জন্য চাপ দিয়েছিলেন কেন? যদি সত্যিই নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের উপর তিনি বিরক্ত হয়ে থাকতেন তবে দেশ চিরকালের মতো কংগ্রেস ও রাজনীতির ছেড়ে গেলেন না? কেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে আবার কংগ্রেসে ছিলেন?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল আজাদের সম্বন্ধে নির্মোহ আলোচনা করতে ইতস্তত করেছেন। গোলমাল বেঁধেছে সেখানেই।

—কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী, ইছাপুর,

উত্তর ২৪ পরগণা।

মহাকরণে শ্যামাপ্রসাদ বিস্মৃত !

পশ্চিমবাংলায় নতুন জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্য সরকারের প্রধান দপ্তর মহাকরণে একটি সদর্থক প্রবণতা আমাদের সকলের চোখে পড়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রায়ই মহাকরণের অলিন্দে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক্ পালদের এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরযোদ্ধাদের স্মরণ করা হচ্ছে। এই সব দেশপূজ্য ব্যক্তিদের ছবিতে মাল্যদান করার সঙ্গে কিছু সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানও হচ্ছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকারের আমলে আমরা এই দৃশ্য মহাকরণে দেখিনি। আর বর্তমান শিক্ষিত মানসিকতা ছোট-বড় সবার ক্ষেত্রে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দেশের জ্ঞানী-গুণী, স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সংগ্রামীদের কোনওভাবে স্মরণ করা এরা ভাবতেই পারে না! তাই ছোট আকারে হলেও মহাকরণে এই বিদ্বজ্জন ও দেশের স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গীকৃত মহান ব্যক্তিদের এই স্মরণ সুস্থ রুচি, সততার, চারিত্রের এক জীবন্ত চিত্র। বিদ্রোহী কবি নজরুল, অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ, অসাধারণ বিপ্লবী বাঘাযতীনের মাল্যভূষিত ছবি দেখলে সত্যিই নির্মল আনন্দে ও প্রত্যাশায় মন ভরে যায়।

গত ৬ জুলাই, ২০১১ গেছে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। দেশবাসী স্বাভাবিক কারণেই আশা করেছিল ওইদিন মহাকরণে ভারতমাতার এই বরেণ্য সন্তানের চিত্র পুষ্প-মাল্যবরণ করে নেওয়া হবে! গভীর দুঃখ-বেদনার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলুম শ্যামাপ্রসাদ পূজিত হলেন না! অলক্ষ্যে রয়ে গেলেন! ঘটনাটি সংকীর্ণচিত্ততার একটি নির্ভেজাল ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রইল দেশবাসী ও অভিজ্ঞজনের কাছে।

বঙ্গ তথা ভারত-রবি শ্যামাপ্রসাদ দলীয় নেতা নন। তিনি জাতীয় নেতা। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর তিনিই বঙ্গীয় এবং ভারতীয় রাজনীতির একজন উজ্জীবিত প্রাণপুরুষ। তারও আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অবিভক্ত বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরূপে তাঁর কাজ ইতিহাসের পরিচর্চার বিষয়। তাঁরই আমলে ও আহ্বানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের বাংলায় ভাষণ সেই প্রথম ও সেই শেষ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা। ইংরেজ শাসকদের কু-চক্রান্তে সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব পাকিস্তানে চলে যেতে বসেছিল! তেজস্বী ও বহুদর্শী শ্যামাপ্রসাদ যুক্তিজাল বিস্তার করে পশ্চিমবাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে বের করে এনে ভারতে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত থেকে এইভাবেই বাংলা ও পাঞ্জাবকে শ্যামাপ্রসাদ সেদিন বাঁচিয়েছিলেন। দেশ ও জাতির সেবা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি আন্দোলনে আটক হয়ে জম্মুতে অকালে ভারতজননীর এই মহান সন্তান রহস্যময় পরিবেশে প্রয়াত হন। আজ পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা রাজনীতি করছেন এবং ক্ষমতায় আসছেন সবই শ্যামাপ্রসাদের দৌলতে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না! তাঁর জন্মদিন পালন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং অনেক বড় আকারে। তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন ও সাধনা তুলে ধরা দরকার। অবশ্য সেখানে এই কাজের জন্যে সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া ছাড়া উদ্দেশ্য সফল হতে পারবে না! তাই মহাকরণে তাঁর ছবিতে মাল্য ও পুষ্পদান হলে দেশ ও জাতির প্রতি এই মহান সন্তানের অবদানের সামান্য স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যেত। শ্যামাপ্রসাদ অমর আত্মা। তাঁকে বিস্মৃত হওয়া চরম অকৃতজ্ঞতা।

—রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৭০০০৩৬।

সাম্প্রদায়িক চিহ্ন

নির্বাচনের প্রচারে জনমতকে প্রভাবিত করে নিজ মতাদর্শে আনার জন্য দূরদর্শনের ব্যবহার মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। যেটি উল্লেখযোগ্য তা হলো বিশেষ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করা। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার জন্য দাড়ি, টুপি, লুঙ্গির ব্যবহার হয়েছে যথেচ্ছোভাবে। ভারত বহুত্বের দেশ। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ভারতের মূল মন্ত্র। ভারতীয় মুসলমান সমাজ এই বহুত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্র— সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, বিনোদন, বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদিতে ভারতীয় মুসলমানরা সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ তাঁরা সংখ্যালঘু বলে নয় অথবা টুপি-লুঙ্গি পরিহিত বলে নয়। এর কারণ তারা যোগ্য। লুঙ্গি-টুপি পরিহিত দূরদর্শনের পর্দার বিজ্ঞাপনের দরিদ্র কৃষক এই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। বিশেষ কিছু চিহ্ন দিয়ে তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টার অর্থ তাঁদের এই অনুষঙ্গের মধ্যে আটকে রেখে ভারত মহাদেশের অগ্রগতির ধারা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা। এটি মুসলমান সমাজের প্রতি অসম্মান জনকই নয়, ক্ষতিকর অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টা ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলির সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে নগ্ন করে দেয়। এই প্রচেষ্টা ঘৃণ্য, রাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক।

ভারতে বসবাসকারী মুসলমান যেমন সংখ্যালঘু, তেমন-ই সংখ্যালঘু খৃস্টান, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই সকল সম্প্রদায় স্থান পান না ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলির বিজ্ঞাপনে। কারণ এঁদের সংখ্যা নগণ্য। এঁরা নির্বাচনের ফলকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করতে পারেন না। ক্ষমতার রাজনৈতিক পাশাখেলায় এঁরা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

বন্ধ হওয়া উচিত এই সকল সাম্প্রদায়িক বিষে জারিত বিজ্ঞাপন। নগ্ন হোক এই সকল ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িক চরিত্র।

—তাপস শংকর দাস, ন-পাড়া কালীবাড়ি রোড, বারাসাত।

সন্ত্রাসবাদ ও আমরা

বিগত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জনতাপার্টির সভাপতি সুব্রামনিয়ম স্বামীর বিরুদ্ধে একটি ইংরেজ মিডিয়ায় প্রচণ্ড— বিষোদগার করা হচ্ছিল। তিনি নাকি এমন কিছু লিখেছেন যার জন্য, তার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু কমিশন কড়া ব্যবস্থা নেবে, এফ, আই, আর করবে, হার্ভার্ড ইউ থেকে বহিষ্কার করবে ইত্যাদি। কিন্তু তারপর আর কোনও কিছু শোনা যায়নি। পরে স্বস্তিকার ১৫ আগস্ট সংখ্যায় ডঃ স্বামীর লেখা 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদই জাতীয় নিরাপত্তার ১নং সমস্যা' দেখে বিষয়টা বোঝা গেল।

ডঃ স্বামী প্রতিটি হিন্দুকে বিকট হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত করে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন এবং তার জন্য তিনি সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যও হিন্দুদের কর্তব্য কি হবে, সেইসব আলোচনা করেছেন। পাঠকবর্গকে অনুরোধ যারা ১৫ আগস্ট স্বস্তিকা পড়েননি, তাঁরা পড়ে দেখবেন। তবে তিনি যা লিখেছেন তার ২/১টি এখানে দেওয়া হলো—

সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য : (১) ভারতকে ভয় দেখিয়ে কাশ্মীরকে বাগে আনব। আমাদের কৌশল : সংবিধানের ৩৭০ ধারার অবসান, প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন, হিন্দুপণ্ডিতদের জন্য 'আনুন কাশ্মীর' তৈরী করা ইত্যাদি এইরকম ৫টি সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ও আমাদের (হিন্দুদের) কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে বলেছেন যদি ইহুদিরা ভেড়ার মতো চুপচাপ গ্যাস চেম্বারে প্রবেশ করা থেকে মাত্র ১০ বছরে হিংস্র সিংহে পরিণত হতে পারে তবে তার থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় থাকা হিন্দুদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। (১) ইজরায়েল কিন্তু মিশর সহ ৭টি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিল। (২) গুরু গোবিন্দ সিং দেখিয়েছে যে ৫ জন ভয়-ডর হীন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্বে কিভাবে একটি গোটা সমাজ পরিবর্তিত হতে পারে।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

আশ্চর্য মাস অক্টোবর

ডঃ সর্বাণী চক্রবর্তী

১৯০৫ সালে হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলন সরকারীভাবে কার্যকরী হয় ১৬ অক্টোবর। সেদিন কলকাতার পথে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি তথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ মিছিল নিয়ে পথে বেরিয়েছেন। সকলের হাতে পরিয়ে দিচ্ছেন মিলনের রাখী। বিশ্বকবির সেই বিখ্যাত গান সবাই একই সুরে গেয়ে ওঠেন— 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।' এই মধুর ধ্বনি সেদিন আকাশে স্পর্শ করতে স্পর্ধা রেখেছিল। আমরা জানি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদেই মরমী কবি এই গানটি রচনা করেছিলেন। ঠিক এর বছর পাঁচেক আগে সম্রাট সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকা থেকে প্যারিসে পৌঁছলেন। সালটি হলো ১৯০০ খৃস্টাব্দের ১০ অক্টোবর। উদ্দেশ্য ছিল 'ধর্ম ইতিহাস কংগ্রেসে' যোগ দেওয়া। এর অল্প কিছুদিন পরে অর্থাৎ ২৩ অক্টোবর ওই প্যারিসেই একটি প্রদর্শনী হয়। সেখানে বিজ্ঞানসাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের স্নায়ুতন্তুতে বিদ্যুৎ প্রবাহে সাড়ার প্রমাণ দেখিয়ে তৎকালীন ইউরোপীয় জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন এই অক্টোবর মাসে।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের (১৯০২ সালের ১ জুলাই) মাস তিনেকের পরেই অর্থাৎ ১৯০২ সালের ২১ অক্টোবর সিস্টার নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে ঋষি শ্রী অরবিন্দের হাতে তাঁর গুরুর লেখা 'রাজযোগ' গ্রন্থটি তুলে দেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি নিবেদিতার জন্মও এই মাসের ২৮ তারিখে। আর ক'দিন পরেই হবে তাঁর জন্মদিন পালন। 'বঙ্গভঙ্গে'র আন্দোলনের ঠিক দু'বছর পরে ১৬ অক্টোবর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিং-এ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় জোরাল প্রতিবাদ করেন। এর ঠিক দশদিন পরে ২৬ অক্টোবর বিপ্লবী নেত্রী মাদাম কামা ভারতের স্বাধীনতার কাজে সুদূর নিউইয়র্কে যান। ১৯০৮ সালের ১৯ অক্টোবর সেসনজজ বীচক্রফ্‌টের আদালতে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হয়। ঠিক তার দু'দিন পরে ২১ অক্টোবর বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইংরাজের আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন সমগ্র ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের অঙ্গ হিসাবে 'ইন্দো-জার্মান-তুর্কী মিশন' নিয়ে বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কাবুলে পৌঁছান

১৯১৫ সালের ২ অক্টোবর। এই বছরেই ২৯ অক্টোবর ইংরাজের চক্রান্তে 'লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট' অনুযায়ী পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় মুসলমানদের। এর ঠিক পাঁচ বছর পরেই অর্থাৎ ১৯২০ সালের ২ অক্টোবর হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্ট পদত্যাগ

করেন। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর সাহসিক পদক্ষেপ ঘটে তাঁর পুণ্য জন্মদিনে। ১৯২০ সালের ১৬ অক্টোবর গান্ধীজী ঘোষণা করেন এক বছরের মধ্যেই ''স্বরাজ'' আসবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় 'ফরওয়ার্ড পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের ২৫ অক্টোবর। ১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর দিনটি খুবই করুণ। কারণ, ওই দিনে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে রাজগুরু ও শুকদেব মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩১ সালের ১৬ অক্টোবর ইংল্যান্ডের 'লেবার পার্টি' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থন করেন। ১৯৩৫ সালের ১৩ অক্টোবর ভারতের সংবিধান রচনাকার ডা. বি আর আম্বেদকর ঘোষণা করেন তথাকথিত নিম্নবর্ণেরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হবেন। ১৯৩৭ সালের ১৭ অক্টোবর মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' পরিকল্পনাটি পেশ করেন মহম্মদ আলী-জিন্না। ১৯৪৩ সালের ১৭ অক্টোবরের ক'টা দিন আনন্দেই কাটে। ওই সালের ২১ অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের 'আজাদ হিন্দ সরকার' সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের দিনই খোলা হয় 'রাণী ঝাঁসী বাহিনী'র শিক্ষা শিবির। আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেন জাপান ২৩ অক্টোবর। এর ঠিক পরের দিনই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। এই ঘোষণা করেন আজাদ হিন্দ সরকারই। অবশেষে ২৯ অক্টোবর জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি দেশ আজাদ হিন্দু সরকারকে স্বীকৃতি দেন।

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গাওয়া গান ১৮৮৫, ২৪ অক্টোবর 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতা'। ১৯০১ সালের ১৭-২২ অক্টোবর বেলুড়মঠে স্বামীজী জগজ্জননীরূপে মা সারদাকে পূজা করেন। ১৮৯৮ সালের ১৬ ও ২৬ অক্টোবর স্বামীজী অসুস্থ খেতড়ির মহারাজকে চিঠি লেখেন। আবার ২৮ অক্টোবর সুদূর লন্ডন থেকে আলাসিঙ্গাকে পত্র লেখেন।

১৮৪১ সালের ২০ অক্টোবর সোমবার মাইকেল মধুসূদন মাত্র ১৭ বছর বয়সে সুরাপান করেছিলেন। তাঁর প্রাণের বন্ধু যিনি নাকি বৈষ্ণব ছিলেন সেই গৌরদাস বসাককে সেই পানের আসরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন পত্র লিখে। এছাড়া প্রাচীন কাগজ পত্র থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। ১৮৩৪ সালের ১৫ অক্টোবর রাধানাথ শিকদার দেরাদুনে রওনা হন ডেভিড হেয়ারের কথায়। এভারেস্টের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই রাধানাথকে তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং অফিস শেষে চা খেতে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন।

১৭৩৪ সালের ৯ অক্টোবর ভাটার সময় গঙ্গা এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে লোকে হেঁটে গঙ্গা পার হয়। হিন্দু কলেজে ১৮৩২ সালের ১৭ অক্টোবর সাড়া পড়ে যায় যখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃস্টান হয়ে গেছেন। ওই দিনই ইংল্যান্ডে 'ভারত পথিক' রাজা রামমোহন রায় সগৌরবে ঘোষণা করেন স্বাধীনতাকামীদের জয় সুনিশ্চিত। ১৮৩৬ সালের ১৮ অক্টোবর মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে তোপধ্বনি করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের (মুম্বাই)-এর বুকে ঠাঁই পেতে চলেছে দ্বিতীয় বিমানবন্দরটি। তারিখটি হচ্ছে ২৬ অক্টোবর ২০১১। এর নাম রাখা হচ্ছে 'সিরডি সাঁই বাবা বিমানবন্দর।'

রাজার কর্মী বাছাই

কোনও কর্মীই রাজার পছন্দ হয় না। নিজের বিশেষ কাজের জন্য কর্মী বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা রয়েছে। যেমন তেমন লোককে তো সব কাজের জন্যে নেওয়া যায় না। আবার খেয়াল রাখতে হয় রাজার কাজ করার জন্য যাকে আনা হবে সে কতটা তৈরি। মন্ত্রীমশাই লোক বাছার কাজ করেন। তিনি দেখেন, ১. যাকে কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে তার আচার-ব্যবহার কেমন। রাজমহলে কাজ করার জন্যে যে ধরনের সহবত শিষ্টাচার আয়ত্তে থাকা দরকার তা আছে কিনা। না থাকলে শেখার আগ্রহ আছে কি? ২. যে খাস বেয়ারার কাজ করবে সে কতটা তৎপর। ইঙ্গিত ইশারায় অনেক কথা বুঝে নিতে হয়। সে রাজার ইঙ্গিত ইশারা বুঝে কাজ করতে পারবে? বোঝার জন্যে তাকে চোখ কান মন সজাগ রাখতে হবে। কাজ করতে করতে শিখে যাবে। ৩. প্রশ্নহীন আনুগত্য তো থাকা দরকার। যখন যা ফরমাশ করবেন রাজা, তা শুনতে হবে। কোন কাজ কীভাবে হবে সেটাও বুঝে নেওয়া দরকার। ৪. একজনের জন্যে কোন কাজ নির্দিষ্ট থাকলেও যদি অন্য সহায়ক অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে কাজ সারতে হয় দক্ষতার সঙ্গে। রাজা যেন কোনওসময় বুঝতে না পারেন। আসল কথা রাজার কোনওরকম অসুবিধে ঘটানো চলবে না। ৫. রাজা নিজের মেজাজমরজি মাফিক বলবেন, সহায়ক কর্মীকে সব বুঝে নিতে হবে। কিছু চাইবার আগে রাজা হাতের সামনে তা মজুত দেখলে খুশি হবেন। ৬. রাজার কোনওরকম খোশখেয়াল নেই, তবে তিনি সব কাজ নিয়মশৃঙ্খলায় করতে চান। সেটা কর্ম-সহায়ককে আন্দাজ করা চাই। ৭. রাজকর্মচারীর সাজপোষাকে সুরুচির ছাপ থাকবে। পরিচ্ছন্ন এবং দৃষ্টিনন্দন হবে। ৮. সেই কর্মীরা অন্যদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে। যাতে বোঝা যাবে রাজার মতো রাজকর্মীরাও ভালো। ৯. রাজকর্মচারী কথা বলবে কম, শুনবে বেশি। সৌজন্য বজায় রেখে হাসিমুখে সব কাজ করবে। ১০. সব কাজ করলেও আত্মমর্যাদা বজায় রাখবে।

মন্ত্রীমশাই ভেবেচিন্তে লোক বাছাই করতেন। বাছাইয়ে ভুল হলে অনেকরকম সমস্যা দেখা দেবে। মন্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনে কোনরকম ফাঁক রাখেননি। তাঁকে সবদিকে নজর রাখতে হয়। কোথাও যেন ত্রুটি না থাকে। সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কাজ করার দিকে তাঁর সতর্ক লক্ষ্য থাকে। রাজাকে খুশি এবং তৃপ্ত রাখার দিকে যেমন তাঁর সতর্ক নজর, তেমনি ভাবেন রাজকর্মচারীদের কথা। কারণ রাজকর্মচারীরা অখুশি অতৃপ্ত অভুক্ত থাকলে কোনও কাজ ঠিকমতো এগোবে না। সমস্যা জমে উঠবে। অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলবে। তাতে অনেকরকম ঝামেলা দেখা দেবে। যা সামলানো কঠিন হতে পারে। এত কাজের মধ্যেও মন্ত্রীমশাই মনমেজাজ ঠিক রাখেন। কারণ তিনি জানেন চাপের মধ্যে কাজ করা মানে মনকে চাপে রাখা। তাতে ক্ষতি হয়। মনের মধ্যে সেফটি ভালব থাকা দরকার। তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে অতিরিক্ত চাপ।

রাজার বিশেষ সেবক নিয়োগ করার আগে কয়েকজনকে দেখলেন মন্ত্রীমশাই। রাজকর্মী হওয়ার জন্যে অনেকে আগ্রহী। কিন্তু যাকে তাকে তো রাজমহলে পাঠানো যায় না। মন্ত্রীমশাই যাচাই করলেন। তারপর একজনকে পাঠালেন রাজার কাছে। সুন্দর গড়ন, হাসিখুশি প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী। সহবত জানে। মন্ত্রীমশাই অবশ্য আগেভাবে কাজের তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কারণ রীতি-নিয়ম না জানা কর্মীকে তো রাজার কাজের জন্যে পাঠানো যায় না। মন্ত্রীমশাইয়ের সিদ্ধান্তের উপর পুরো ভরসা ছিল রাজার। তবু তিনি মাঝে মাঝে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে মজা করতেন। মেজাজ খারাপ থাকলে একটু কড়া কড়া কথা বলেন। মন্ত্রীমশাই সব শুনে অপেক্ষা করেন সময়ের জন্যে। সময় এলে মন্ত্রীমশাই জবাব দিয়ে দেন ভালোভাবে। অপেক্ষা করতে হয় সুযোগ আর সময়ের জন্যে।

রাজা বললেন, মন্ত্রীমশাইকে, 'আপনার সব কাজই ভালো। অনেক দায়দায়িত্ব হাসিমুখে সামলান। বলার কিছু থাকে না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করেন যেটা মন মানতে চায় না।' মন্ত্রী বললেন, 'তেমন কিছু হয়েছে নাকি'। রাজা বললেন, 'একটা ব্যাপার হয়েছে। আপনি কদিন আগে আমার খাস বেয়ারা হিসেবে একজনকে নিয়োগ করেছেন। ছেলেটি কাজকর্ম জানে। কিন্তু দেখতে ভালো নয়।' মন্ত্রীমশাই কোনও জবাব দিলেন না রাজার কথার।

বেশ গরম পড়েছে। রাজ দরবারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত টানা চাপ ছিল। মন্ত্রীর পরামর্শে সব সিদ্ধান্তে নিলেও রাজাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। সবকিছু লক্ষ্য করেছেন। অনেক সিদ্ধান্ত সায় দিতে হয়েছে। আবার অনেক সময় অসম্মতি প্রকাশ করতে হয়েছে। সব মন্ত্রীর পরামর্শ মতো হলেও রাজার নিজস্ব বোধ বিবেচনা সক্রিয় থেকেছে। রাজা তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন কাজ করতে করতে। অন্যদিন রাজার হাতের কাছেই জলপাত্র নিয়ে হাজির থাকে রাজকর্মচারী। শীতল সুবাসিত জল। সেবকদের জানা আছে কখন কোন ধরনের পানীয় রাজার পছন্দ। সেদিন রাজা নিজে জল চাইলেন। কিছুদিন আগে কাজ করতে আসা সেই কর্মীটি জল নিয়ে ঢুকলেন ধীর পায়ে। সোনার পাত্রে জল। রাজা পাত্রের ঢাকনা খুলে জল একটু মুখে দিয়ে কুলকুচি করে ফেললেন বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জল। বললেন, এই গরমে কষ্ট পাচ্ছি। সোনার পাত্রে জল এনেছো! তাতেতো আরও গরম হবে।' কর্মী পাত্র তুলে নিয়ে চলে গেলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঢুকল মাটির পাত্র নিয়ে। একই ভঙ্গি। ঠাণ্ডা সুবাসিত জল। রাজা হাতে নিয়েই খুশি। পাত্রে মুখ দিয়ে তৃপ্ত। তৃষ্ণা মিটল জল পান করে। পাত্রটি যত্নে রেখে পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে তাকালেন রাজকর্মীর দিকে। কর্মী অভ্যস্ত ভঙ্গিতে অভিবাদন করে চলে গেলো।

মন্ত্রীমশাই সব লক্ষ্য করছিলেন। রাজার তৃষ্ণা মিটতে তিনি মন্ত্রীমশাইকে দেখলেন। তিনি মিটিমিটি হাসছিলেন। রাজা বললেন, 'মন্ত্রীমশাই হাসছেন কেন? হাসার মতো কিছু হয়েছে কি?'

মন্ত্রী বললেন, 'দেখছিলাম সোনার পাত্র আর মাটির পাত্রে জলের তফাতটা। সুন্দর স্বর্ণপাত্রের জল আপনি গরম পানযোগ্য নয় বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর সামান্য দামের মাটির পাত্রের জল কত তৃপ্তিতে পান করলেন।'

রাজা বললেন, 'তার মানে আপনি এর মধ্যে অন্যকিছু দেখেছেন? কি দেখছেন বলুন?'

মন্ত্রী বললেন, 'কারও বাইরের রূপ দেখে বোঝা যায় না তার ভিতরে কি আছে। আর বাইরের রূপ দেখে বিচার করতে গেলে অনেক সময়েই ভুল হতে পারে। হয়তো।

রাজা একটু ভেবে বললেন,' ঠিকই তো। আমার ধারণা ভুল ছিল। আপনার পাঠানো খাস বেয়ারাকে দেখতে ভালো নয় বলেছিলাম। এখন দেখছি ওইরকম বিচার ঠিক নয়। ছেলেটি সত্যিই কাজের। তার গুণ যথেষ্ট। রূপ না থাকুক।

রাজার এমন স্বীকারোক্তি শুনে খুশি হলেন মন্ত্রী। রাজার চেতনা, অন্যভাবে জেগে উঠেছে বুঝতে পারলেন তিনি।

গাউটী আর্থরাইটিস

ডাঃ আর এন দাস

এই রোগটা বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় রাজা-রাজড়াদের পরিবারে। ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি রোগ দেখা যায় যার মধ্যে গাউটী একটি অন্যতম রোগ। রোমান যুগে দেখা যায় সম্রাট ও তার সেনেটররা সকাল/সন্ধ্যা লবণ ও বরফের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে থাকেন। মিশরের ফারাওদের মমিতেও পাওয়া গেছে বুড়ো আঙুলের হাড়ে বঁড়শির মতো ক্ষয়গ্রস্ত হাড়ের সন্ধান। পুরাকালে লোকের স্পষ্ট ধারণা ছিল যারা মদ খায়, মাছ মাংস বেশি পরিমাণে খায় তাদের পায়ের অস্থিসন্ধিতে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক এক বিশেষ প্রকারের বাত রোগের প্রাদুর্ভাব হোত। পুরুষ, যাদের বয়স ৫০ পেরিয়েছে তারাই এর শিকার হোত। মেয়েদেরও এই রোগ হয় তবে তাদের মাসিক ধর্ম বন্ধ হয়ে যাবার পর এই গাউটী আর্থরাইটিস সবচেয়ে বেশি হয়।

কি কারণে এই রোগ হয়? এর উত্তর হচ্ছে আমাদের দেশে এক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ যেটা বর্জ্য পদার্থ হিসাবেই পরিগণিত তার নাম ইউরিক অ্যাসিড। এটা আসে খাবার Purine Rich Diet থেকে। কি সেই খাবার? মাছ (ছোট-বড় সবই), মাংস, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি বেশি পরিমাণে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার ডাল, বিন্‌স, মটরশুঁটি কড়াইশুঁটি, মাসরুম এইসবের মধ্যেই কমবেশী কিছু পরিমাণ Purin থাকে; যার থেকে Xanthine বা Hypoxanthine oxidase নামক এনজাইম দ্বারা বিপাকীয় ক্রিয়া দ্বারা এই ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তাপ রক্ত দ্বারা প্রবাহিত হয় লিভার (যকৃত) থেকে কিডনিতে। তারপর মূত্রের সঙ্গে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। রক্তের ধারক ক্ষমতা নির্দিষ্ট। পুরুষের ক্ষেত্রে ৬ মিলিগ্রাম (মহিলার ক্ষেত্রে ৫ মিলিগ্রাম) প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে। তার বেশী হলেই ওই ইউরিক অ্যাসিড দেহের বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকে। পায়ের জয়েন্টগুলো প্রধানত আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ এটা একটা দেহের বিপাকীয় ক্রিয়ার ত্রুটির জন্য এক বিশেষ ধরনের বাতরোগ। কিডনির রোগে দেহের মধ্যে এই রাসায়নিক পদার্থটি বর্জিত হতে পারে না বলে জমে ওঠে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে জমে। এছাড়া লিউকোমিয়া জাতীয় রোগীর শরীরে যা বিভিন্ন প্রকার ক্যানসার রোগীর অস্থিসন্ধিতেও এই গেঁটে বাতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অর্থাৎ কিনা যেখানেই শরীরে অত্যধিক পরিমাণ কোষের সৃষ্টি যা বিভাজন হয় বা কোষগুলো ভেঙ্গে যায়— সেখানেই বেশি পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়।

লক্ষণগুলো কি কি?

সাধারণত, মধ্যবয়স্ক কোনও ব্যক্তির পায়ের বুড়ো আঙুলের অস্থিসন্ধি হঠাৎ করে সকালবেলা উঠেই দেখা যায় টকটকে লাল হয়ে যায়, অসহ্য যন্ত্রণায় ফুলে যাওয়া। সময় সময় ব্যথার তাড়সে

জ্বর পর্যন্ত চলে আসে। গোড়ালীর অস্থিসন্ধি, হাঁটু ছাড়াও, হাতের আঙুলের গাঁটগুলোও সময় সময় ব্যথা হয়। মজার বিষয় হলো— এই সময়ে যদি রক্তে ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করা যায় : ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইউরিক অ্যাসিড-এর মাত্রা অনেক কমে গেছে। বারবার একই জয়েন্ট আক্রান্ত হলে সেটা বিকৃত হয় তখন তাকে Podagra বলে। যারা বহুদিন ধরে কিডনির অসুখে ভুগছেন তাদের কনুই বা কানের বাইরের অংশেও ইউরিক অ্যাসিড জমে জমে ফুলে যায় এমনকি সাদা চুনের মতো বা কলগেট পেস্টের মতো জিনিস বেরোয় এগুলোকে Tophaceons Gout বলে। বেশ কিছুদিন ভালো থাকে আবার হয়তো একদিন বেশি মদ-মাংস খাওয়া হলো তারপর দিনই সকালে অসহ্য যন্ত্রণাতে মাটিতে পা ফেলার মতো অবস্থা থাকে না।

ডাইয়াগনোসিস : অভিজ্ঞ ডাক্তার বাইরেটা দেখেই গাউটী আর্থরাইটিস বলতে পারেন। তাছাড়া জয়েন্ট-এর রস নিয়ে লাইট মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে ইউরিক অ্যাসিড-এর সূচের মতো তীক্ষ্ণ হালকা হলুদ বর্ণের ক্রিস্টাল পাওয়া যায়। রক্ত পরীক্ষা করা যায় এবং X-ray করা হয় সেখানে ব্যাথা বা ফোলা আছে সেখানে।

উপাচার/উপসম : (ক) লাইফস্টাইল পরিবর্তন : মদ, মাছ, মাংস, ইত্যাদি ত্যাগ বা কম মাত্রায় খাওয়া। ওজন কমানো নিরামিষ ভোজন করা, অধিক জলপান ইত্যাদি। অনাবশ্যক কারণে অনভ্যস্ত ব্যক্তির অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামও ক্ষতিকর।

(খ) **মেডিক্যাল :** (১) ব্যথা কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার Nzaids, Colchicine এবং Steroid শেষোক্ত ওষুধটি স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় (Injection বা Tablet) তাতে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। (২) এছাড়া আর এক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো মূত্রের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড-কে বার করে দেয়, যেমন—

(গ) Probenecid বা Sulphinpyrazone। আরও এক ধরনের ওষুধ আছে যা এনজাইমকে অবরুদ্ধ করে ইউরিক অ্যাসিড তৈরিতে বাধার সৃষ্টি করে যেমন--- Allopurinoz উপরোক্ত ওষুধগুলো ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন দিক বিচার করে তবেই বিশেষ রুগীর জন্য উপযুক্ত যেটি সেটির প্রয়োগ করেন। অন্যথায় মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

পুজোর মরসুমে নারীরূপী দেবীপূজা

মিতা রায়

আশ্বিন-কার্তিক মাস জুড়ে থাকে পুজোপুজো গন্ধ। পুজোর মরসুমে মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু হলেন 'মা দুর্গা'। যাকে মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের কন্যা হিসেবে কল্পনা করা হয়। তাই তো মা উমার আগমনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কবিরা 'আগমনী গান' রচনা করেছেন। মা উমাকে বছরভর দেখতে না পেয়ে মা মেনকার মন উদ্বেল হয়ে উঠছে। উমার পিতাকে অনুরোধ করছেন, হিমালয় থেকে উমাকে নিয়ে আসার জন্য— আর সেই আসাকে কেন্দ্র করেই আকাশে বাতাসে মাঠে প্রান্তরে মনুষ্য জীবনে আনন্দের জোয়ার ওঠে। যে যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে দিন কাটাক না কেন, এ ক'দিন সব ভুলে মা'র আহ্বানে মেতে ওঠে। মা দুর্গার সঙ্গে আসেন দুই পুত্র ছাড়া লক্ষ্মী সরস্বতী। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব গুণে গুণান্বিতা। তাঁরাও আমাদের আরাধ্যা।

দুর্গোৎসবের পর পালন করা হয় লক্ষ্মীপুজো। সমৃদ্ধির দেবী মা লক্ষ্মী— তিনি আসেন ধন-সম্পদে পূর্ণ করতে ভক্তের সংসার। কার্তিক মাসে শ্যামা-মার পুজো— যিনি নারীশক্তির আরেক রূপ। সংহারিণী রুদ্ররূপিণী মা কালী সব শেষে প্রলয়ের বুকে পদ রেখে ধরাকে শান্ত করেন। তিনিও সেই নারীশক্তি। জগদ্ধাত্রী পুজো মা দুর্গারই আরেক রূপ। জগদ্ধাত্রী দেবীকে আহ্বান ও বরণ করে ঘরে তোলে মর্ত্যবাসী। এভাবে আমরা দেখি ভক্তের কাছে নারীশক্তি আরাধ্যা এবং পূজিতা। দেবীজ্ঞানে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে অগণিত ভক্তমণ্ডলী। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্পষ্টত যে, সংসারে নারী লক্ষ্মী, শ্রী, ও শক্তির প্রতীক। কথায় আছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে নারী দেবী কল্পারূপে, বাস্তবে সেই নারী দেবী তো দূরের কথা, সংসারের গৃহকর্ত্রী, গৃহবধূ হিসেবে অসম্মান আর নির্যাতনের শিকার। সংসারের সব দায়িত্ব নেবে, দেখভাল করবে, কিন্তু তার নিজস্বতা হিসেবে কিছু থাকতে পারবে না। সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কন্যা সন্তান জন্ম হলেই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার তো চলেই; সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়। তখনই সেই ছবিটা চোখে ভাসে— মহাষ্টমীর পুজোয় একটি নাবালিকা কিশোরীকে দেবীজ্ঞানে পুজো করেন পূজারীরা। তাহলে কন্যাসন্তান কেন এত ব্রাত্য!

অঙ্গনা

আমরা চণ্ডীতে দেখি, আসুরীয় শক্তির উৎপাতে যখন দেবতারা ত্রস্ত, অসহায়, তখন তাঁরা নারীর শরণাপন্ন হয়ে সকল দেবতার দেওয়া নানা অস্ত্রে সজ্জিত করে 'রণং দেহি' মূর্তিতে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে অসুর নিধন করার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং, দেবলোকের মতোই সংসারে নারীর শক্তিই সংসারকে শান্তিপূর্ণ করে তুলতে পারে। নারী সর্বংসহা। আমাদের সমাজের বিধি বিধান অনুসারে পুরুষের প্রাধান্য বেশি। নারীকে অত্যন্ত নগণ্যরূপে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এখানেই এক বিশাল প্রশ্ন জাগে— নারীই যদি দেবী দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রীরূপে প্রতিভাত হন, তাহলে সংসারে নারী— সে কন্যা, বধূ, গৃহকর্ত্রী যে রূপেই দেখা হোক না কেন, যথাযথ মর্যাদা পান না কেন?

ব্যাপক অর্থে দেখলে দেখা যায়, পুরুষ ও নারী সৃষ্টির ধারক। একে অন্যের পরিপূরক। শুধুমাত্র কোনও একটি শক্তি দ্বারা ধরা সৃষ্টি হতে পারে না। যতই শাস্ত্র, তথ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি না কেন, নারীদের স্থান সমাজে সাম্প্রতিককালেও অত্যন্ত হীন। কিন্তু উপনিষদে দেখি, সেখানে মুনি ঋষিরা নারীদের সম্মান দিতেন। কিন্তু পুরাকাল থেকে যত আধুনিকতর হয়ে উঠছে মানুষ, নানা ক্ষেত্রে উন্নতির সাফল্য হচ্ছে; ততই মানসিকতার দিক থেকে পুরুষজাত সংকীর্ণমনা হয়ে পড়ছে।

আরাধ্যা দেবীকে যখন 'মাতৃজ্ঞানে' পুজো করা হয়, 'মা' সম্বোধন করা হয়, তখন কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সেই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে না। তাই, পুজোর দিনগুলোতে যখন নারীরূপী দেবীকে আহ্বান জানানো হয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে, তখন সংসারে দেখা যায় নারী জাতির প্রতি চরম অপমান, নিপীড়ন। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নারী তার ভাগ্যকে জয় করে নিতে পেরেছে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে নারী সম্পূর্ণভাবে সকল অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজে নারীর যথাযথ সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

বিদ্যার্থী পরিষদের গৃহপ্রবেশ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর বিদ্যার্থী পরিষদের এরাজ্যের কার্যকর্তাদের বহু- আকাঙ্ক্ষিত নিজস্ব ভবনের শুভ উদ্বোধন হলো। কলকাতার মানিকতলার কাছে ৪৪, বলদেওপাড়া রোড-স্থিত বিদ্যার্থী সদন নামে ওই নতুন ভবনের শুভ সূচনা হয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ও বর্তমানে আর এস এসের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য সভাপতি রবিরঞ্জন সেন, রাজ্য-সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল, বরিষ্ঠ কার্যকর্তা মনীন্দ্র করন প্রমুখ। এই উপলক্ষে পরিষদের সমস্ত প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, রাজ্য সম্পাদক এবং পূর্ণকালীন ও বিস্তারক কার্যকর্তাদের শাল দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর বিদ্যার্থী সদনের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে পূজা-পাঠ ও যাগ-যজ্ঞ করা হয়। পুরোহিত ছিলেন স্বস্তিকা'র সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য। সেদিন বিদ্যার্থী পরিষদকে মার্গদর্শন করাতে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের আরেক সহ সরকার্যবাহ সুরেশ সোনীজী।

দেবদূত-এর উদ্যোগে পথ-শিশুদের বস্ত্র বিতরণ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বাগবাজারে 'বলরাম মন্দির' সংলগ্নস্থানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেবদূত-এর উদ্যোগে পথশিশুদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক জ্ঞানলোকানন্দ ও প্রধান অতিথি ছিলেন 'ভোরের বার্তা'-র বিজ্ঞাপন বিভাগের মুখ্য ব্যবস্থাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য। স্বাগতভাষণ দেন সুশীল রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শশাঙ্কশেখর দে। দেবদূত-এর কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে পরিচালনা করেন সম্পাদক জয়ন্ত সেন।

সমাবেশ সমাচার

মহালয়ায় ধর্মনগরে বস্ত্র বিতরণ

শারদোৎসব উপলক্ষে গত ২৭ সেপ্টেম্বর শুভ মহালয়ার দিনে ত্রিপুরায় শ্রী নিগমানন্দ ভাবনামৃত শাশ্বত সঙ্ঘ এবং ধর্মনগর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে ২৫ জন দুঃস্থকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সুচরিতা দেব। পৌরোহিত্য করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ধর্মনগর মহকুমা সঙ্ঘচালক ভীষ্ম গুপ্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন— জ্যোতিপ্রভা দেব, অঞ্জন চক্রবর্তী, কল্যাণ চক্রবর্তী, ডাঃ আশীষ পাল। ডাঃ পাল তাঁর ভাষণে সমাজসেবার নামে হিন্দুসমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষজনকে ধর্মান্তরকরণের তীব্র সমালোচনা করেন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী অবধি বেহালায় আয়োজিত বুক স্টলের চিত্র।

বেলদাতে সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বেলদা শহরের কাছে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় 'নেকুরসেনী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন'-এ গত ৭ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। প্রশিক্ষক ছিলেন সব্যসাচী দলপতি এবং অনুপম কুইলা। এই সম্ভাষণ বর্গে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে, নিয়মিত রূপে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল ছাত্রছাত্রী অনুভবকথন-সংস্কৃতগীত নৃত্য নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর কার্যবাহী ভারপ্রাপ্ত স্বপন বিশ্বাস এবং সভাপতি ছিলেন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর বেরা। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সংস্কৃত ভারতীর বেলদা অঞ্চলের কেন্দ্র সংযোজিকা শ্রীমতী মৌসুমী মুখোপাধ্যায়।

খাস সমাচারের পুজো সংখ্যার উন্মোচন

গত ২৫ সেপ্টেম্বর, মহালয়ার পুণ্যতিথিতে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া-কোতরং এলাকা থেকে প্রকাশিত 'খাস সমাচার' পত্রিকার পুজো সংখ্যার উন্মোচন হলো। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ স্বামী অনধানন্দ মহারাজ (নিখিল মহারাজ)। সভাপতির ভাষণে তিনি স্থানীয় পত্র-পত্রিকা জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর আলোকপাত করেন। বৃহৎ পত্রিকার পাশাপাশি ছোট-পত্রিকা যে অবজ্ঞার পাত্র নয় তা তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের কাছে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে কোন্নগর- উত্তরপাড়া এলাকার বিশিষ্ট গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রাক্তন ফুটবলার বলরাম, নৃত্যশিল্পী কেয়া চন্দ, চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সহকর্মী অভয়পদ মিত্র (লাটিদা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। পত্রিকার সম্পাদক গোসাই চন্দ্র দাস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে অরূপ চট্টোপাধ্যায়

প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সহ-সভাপতি-তথা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি অরূপ কুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী-পুত্র ও তিন কন্যাসহ গুণমুগ্ধ বন্ধুদের রেখে গেছেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসর আনন্দবাজার ও সংবাদসংস্থা পি টি আই-এর জেলা সংবাদদাতা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া আকাশবাণীতেও কাজ করেছেন। বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত 'হিন্দুবাণী' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই হিন্দুমহাসভায় যোগদান করে বিভিন্ন আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কাশ্মীর আন্দোলন ও বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ আন্দোলনে কারাবরণ করেন।

পরলোকে মধুসূদন বসু

গত ১৩ অক্টোবর বাঁশদ্রোণী শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মধুসূদন বসু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী, এক কন্যা, জামাতা, দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি ও গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবকদের। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর বাঁশদ্রোণী বাজারে ঔষধের দোকান রয়েছে। তিনি মূলত উত্তর কলকাতার স্বয়ংসেবক ছিলেন।

***

পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল পরলোক গমন করেছেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের শারীরিক প্রমুখ তথা সঙ্ঘের প্রচারক পঙ্কজ মণ্ডলের পিতৃদেব। গত ৩ অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার বামনী গ্রামে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক শ্যামল হাতি-র পিতৃদেব শক্তিপদ হাতি গত ১৩ অক্টোবর পরলোক গমন করেছেন। তিন পুত্র ও তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমা সঙ্ঘচালক বিজয়কৃষ্ণ তালুকদারের মাতৃদেবী শান্তিরাণী তালুকদার গত ৪ অক্টোবর বিকালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনী বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৪ জুলাই বিজয়বাবুর পিতৃবিয়োগ হয়েছে।

নেহরু কংগ্রেস আজন্ম আর এস এস এলার্জির শিকার

শিবাজী গুপ্ত

এবছর ১১ এপ্রিলের স্বস্তিকা'য় 'জন্মলগ্নেই সরকারি রোষানলে স্বস্তিকা' শীর্ষক খবরের পরিপূরক হিসেবে দু'চার কথা।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পত্রখানা শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। উক্ত পত্রখানা দশ বছর পূর্বেই সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের 'বঙ্গ সংহার এবং' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ওই চিঠিতে আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার নীতি ও বক্তব্য সম্পর্ক নেহরুজী তার বিরূপ মনোভাবও গোপন রাখেননি :

"The Hindu Mahasabha and R.S.S. propaganda both for war and for a Hindu State has a very bad effect in the present tense situation. I wonder if this can be discouraged."

মোট কথা নেহরুজী সবসময়েই আর এস এস-এলার্জিতে ভুগতেন। গান্ধী হত্যার জন্য ভিত্তিহীন ভাবে আর এস এস-কে ওই অভিযোগ থেকে খালাস দিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করলে নেহরুর মুখ গোমড়া হয়ে যায়।

আসলে, পাঞ্জাবের দাঙ্গার সময় যে অসীম সাহস ও আর্ত-ত্রাণের মাধ্যমে আর এস এস-এর স্বেচ্ছাসেবকগণ অসহায় হিন্দু শিখ নরনারীকে উদ্ধার করে ভারতে এনেছে, তা সর্বজনীন প্রশংসা ও সাধুবাদ অর্জন করলেও নেহরুজীর মনে দাগ কাটেনি। কারণ, এই হিন্দু শিখ উদ্বাস্তুর দলকে রক্ষা না করে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম জল্লাদদের হাতে খতম হতে দিলেই দিল্লীতে তাঁর সুখনিদ্রা ও রাসলীলায় ব্যাঘাত হোত না। উদ্বাস্তুরা সীমান্তের এপার এসে কংগ্রেসের ঝাণ্ডার তলে যোগদান না করে আর এস এস (এবং পরবর্তীকালে জনসঙ্ঘে)-এর ডাণ্ডা ধরাতেই নেহরুজীর আর এস এস-এলার্জি শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

শুধু নেহরুজী নন—কংগ্রেসের বদরক্ত ও হিন্দুত্ব-বিরোধিতা যেসব দল ও ব্যক্তির ধমনীতে প্রবাহিত, তারা কংগ্রেস ছেড়ে পৃথক দল গড়লেও আর এস এস-ম্যানিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যেমন, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত দল ও তার মুখপত্র 'The Nation' পত্রিকা।

১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন আর এস এস প্রধান মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (গুরুজী) দিল্লীতে এলে তাঁকে যে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং নেহরু-মন্ত্রিসভার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে তিনি জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করলে, কংগ্রেস-আর এস এস যুক্তফ্রন্ট গড়ার এক অলীক সম্ভাবনার আশঙ্কা প্রকাশ করে 'The Nation'—পত্রিকার দিল্লীর সংবাদদাতা জানান।

United Front Of Reaction
R.S.S.-CONGRESS ENTENTE
NEW DEAL TO CRUSH FORCES OF PROGRESS
(FROM OUR SPECIAL CORRESPONDENT)

NEW DELHI, AUG. 24—A new deal is being struck now in the capital between R.S.S. and the Central Government members and its parent body, the Congress. The R.S.S. Chief Guruji Golwalkar who is now here and who has been given a rousing reception by his followers has already met a number of Cabinet ministers and Congress leaders. He has come here, it is said, with the blessings of Sardar Patel whom he interviewed in Bombay.

Golwalkar has been granted privileges denied to left laeaders. At the station he was given a reception and was taken out in a procession which the delhi administration, despite Section 144 allowed. He was permitted to address public meetings although in his utterances there was no sign of any repentance for the past nor any visible change of heart or policy. Later he conferred with Cabinet ministers including Bengal's Shyamaprasad Mookerji, met Congress bosses and discussed means of Congress–R.S.S. conciliation. Isolated from all progressive forces of the country the Congress now is thus seeking alliance with rabidly communal and fascist organisations.

What has R.S.S. to offer Congress or country one feels like asking. R.S.S. still stands for a Hindu Raj based upon Hindu culture and civilisation but allegedly it has decided to give up separate politics. And may now merge with Congress for political purposes. Its economic ideology closely resembles that of the Congress. It is anti-Left and is prepared to lend its strength to Congress in the struggle against progressive forces. Congress needs this support badly at least in northern India in the Central States and in part of Maharashtra where the R.S.S. holds a good following and the Congress faces growing mass unrest. In the East Punjab particularly a Congress–R.S.S. deal has become necessary to face the Desh Shevak Party and other Leftist bodies.

THE DELHI PRESS

The Delhi Press which itself is largely communal minded and is a propaganda arm of Government has reacted unfavourably to Golwalkar's activities here. The Hindustan Times pointed out that his speeches offered no reason to think that R.S.S. has changed its old policy. Dalmia's News Chronicle express similar view. The British-owned Statesman which places Master Tara Singh and the Frontier Gandhi Abdul Gaffar Khan on this public criticism, the deal goes on. The R.S.S. rankers, however, do not seem dated at prospects of a deal with the Congress, because there has been too much anti-Congress sentiment in the organisation in the past. But Golwalkar seems to have decided his mind.

In future, the function of the R.S.S. will be to beat the left forces. This is only a part of the frantic efforts to put the hand of clock back.

[25 August, 1949; Vol. J. No. 356; Thursday; pp. 1,8,3c]

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কংগ্রেস ও তার দলছুট এবং মার্কস-মার্গীদের আর এস এস-ভীতি এক জন্মগত ব্যাধি। জাতীয়তাবাদের লগুড়াঘাত ছাড়া এই ব্যাধির নিরাময় দুঃসাধ্য।

হকি : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হয়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নবসের ছেলেরা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত কি কেবল এশিয় স্তরের হকিতেই দাপট দেখিয়ে যাবে? বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় হকির জয়পতাকা কি আর জীবদ্দশায় উড়তে দেখব না? এই প্রশ্ন এই আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ননিবিষ্ট প্রাণচেতনায় আবিষ্ট প্রতিটি হকিপ্রেমী। এইবারের অলিম্পিক খেতাবজয়ী, টানা পঞ্চাশ বছর বিশ্ব হকিতে একাধিপত্যের রাজত্ব কায়েম করে রাখা ভারতীয় হকি কি আর পাশ্চাত্য দুনিয়ার আধিপত্য হঠ করে আর একবার বিশ্ব অলিম্পিকে তুরীয়ান— তুঙ্গীয়ান-বলীয়ান হবে না? শুধুমাত্র এশিয়াকাপ, এশিয়ান চাম্পিয়ন ট্রফি জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে?

পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে চীনের মাটি থেকে এশিয়ান চাম্পিয়নস ট্রফি জয় করে রাজপালের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় হকি দল দেশে ফিরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ছিল এদেশের ক্রীড়ামন্ত্রক ও হকি ফেডারেশনের কর্তাদের বিরুদ্ধে। যথার্থই তার দাবি দাওয়া সম্বলিত বিদ্রোহ। এই টুর্নামেন্টটি নেহাত ফেলনা নয়। হতে পারে এই ভারত ইদানিংকালে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, স্পেনের মতো দলের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছে না। বিশ্বকাপ, অলিম্পিক বা চ্যাম্পিয়ান ট্রফিতে ন্যূনতম সাফল্য নেই। কিন্তু এই চার দলের ঠিক পরের স্তরে রয়েছে যে সব দেশ যেমন পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দলকে বলে বলে হারাচ্ছে আর কাপ জিতছে। এর মধ্যে দু'বার এশিয়ান কাপ ঘরে এসেছে। আর সদ্যসমাপ্ত প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান ট্রফিও ভাঙা, পরীক্ষামূলক দল নিয়ে গিয়ে জিতে এসেছে।

তাহলে কেন খেলোয়াড়রা তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি ও আর্থিক পুরস্কার পাবে না। এই টুর্নামেন্ট জয়ের আর্থিক মূল্যায়ন নিশ্চয়ই ২৫, ০০০ টাকায় হতে পারে না। খেলোয়াড়রা চেক নিতে অস্বীকার করে উচিত কাজই করেছেন। বাধ্য হয়ে ক্রীড়ামন্ত্রককে প্রতি খেলোয়াড় পিছু ১.৫০ লাখ টাকা, সে রাজ্যের জাতীয় খেলোয়াড়দের জন্য বাড়ি করার জমি ও চাকুরিতে প্রমোশনের কথা ঘোষণা করেছেন। বিশ্বায়ন ও ভোগবাদের জমানায় এধরনের সুযোগ- সুবিধে না দিলে চলবে কেন? যেখানে জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা প্রত্যেকেই কোটিপতি। দশ দেশের ক্রিকেট সংসারে কোনও টুর্নামেন্টেই স্বচ্ছতা নেই। ভারতীয় বোর্ডের এত ক্ষমতা ও অর্থবল যে অন্যান্য ক্রিকেট খেলিয়ে প্রতিটি দেশ ভারতের স্বার্থ

মাইকেল জ্যাক নবস

রক্ষা করাটাই প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করে। নিন্দুকেরা বলেন ক্রিকেটাররা মাঠে দেশের জন্য যা যা করেন তা ওই ভারতীয় শিল্পসংস্থা স্পনসরদের অঙ্গুলি হেলনেই।

সেখানে হকি খেলোয়াড়রা নিজের দক্ষতা ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ সহকারে গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে আসেন অন্তত এশিয় স্তরে। ভারতীয় হকি সংস্থা এখন যথেষ্ট স্বচ্ছল। সাহারা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে খেলোয়াড়রা ঘন ঘন বিদেশ সফরে যেতে পারছেন। নানা প্রান্তিক শহরে অ্যাস্ট্রোটার্ফ বসেছে। সব টুর্নামেন্টে স্পনসর থাকায় হকি কর্তাদের অর্থ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় না। কিন্তু এত সব উন্নতি সত্ত্বেও খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফি বা টুর্নামেন্ট জিতলে ইনসেনটিভের পরিমাণ কিন্তু বাড়ানো হয় না। এই বৈষম্য কেন? আর ভারতীয় হকি প্রশাসন এখন দ্বিধাবিভক্ত। হকি ইন্ডিয়া না আই এইচ এফ কোনটি এদেশের হকির প্রকৃতি নিয়ামক? খেলোয়াড়রাও বিভ্রান্ত, এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে। অবিলম্বে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থাকে কঠোর-কঠিন মনোভাব নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোনও একটি সংস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। না হলে আই ও সির কোপে পড়ে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক সিনিয়র, জুনিয়র সব পর্যায়ে টুর্নামেন্ট খেলাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর তা যদি হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হকি নামক জাতীয় খেলাটি অবলুপ্ত হয়ে যাবে ভারত থেকে।

সরকার, হকিকর্তা ও জাতীয় মিডিয়া প্রত্যেকের উচিত সাম্প্রতিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে হকি নিয়ে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে এদেশের হকির সর্বাত্মক পুনরুজ্জীবন। মাইকেল নবস নামক অস্ট্রেলিয়ানকে জাতীয় কোচ করা হয়েছে। নবস যথেষ্ট বুৎপত্তি সম্পন্ন কোচ। নিজেও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ছিলেন। আধুনিক বিশ্বহকির সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। একাধারে তাত্ত্বিক ও গেম রিডিং স্ট্রাটেজি নির্ধারণ, ম্যাচ ম্যানেজমেন্টে পারদর্শী। বহুদিন পরে একজন যোগ্য বিদেশীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে জাতীয় দলকে। এই দলে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা হোক সন্দীপ সিং, অবতার সিং ও প্রভজ্যোত সিংকে। সন্দীপ, সরদার অবশ্যই অন্যায় করেছে ক্যাম্প ছেড়ে গিয়ে। তাদের কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে ফিরিয়ে এনে এই দলের সঙ্গে জুড়ে দিলে আক্রমণ ও রক্ষণে ভারসাম্য আসবে। আর অভিজ্ঞ প্রভজ্যোত আক্রমণে বাড়তি মাত্রা সংযোজন করবেন নিঃসন্দেহে। সামনের বছর জানুয়ারিতে প্রি অলিম্পিক। লন্ডন অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পক্ষে এখনই এই পরিবর্তনগুলো করে ফেলা হোক যাতে ২/৩ মাস অনুশীলনে দলটি আরও শক্তি ও সুসংহত হয়ে ওঠে। না হলে বেজিংয়ের মতো লন্ডনের টিকিটও অধরা থেকে যাবে। এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় হকি, সামনে আছে, বিস্তৃত সৃজনভূমি।

শব্দরূপ-৫৯৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়াঁ

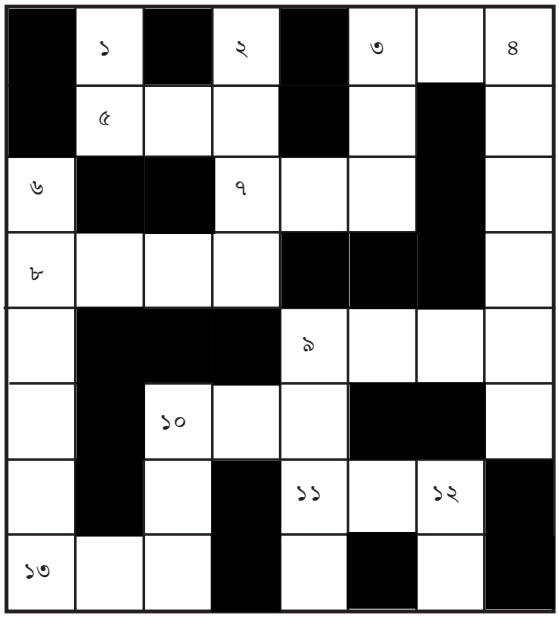

সূত্র :

পাশাপাশি : ৩. সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা, ৫. দেবরাজের সভাগৃহ, ৭. ফোড়ন, সাঁতলাইবার মশলা, ৮. জৈনদিগের চতুর্বিংশতিতম ও শেষ তীর্থঙ্কর, ৯. নিত্য, ব্রহ্মার পুত্র, ১০. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ১১. বিড়ালের ডাক, ১৩. পুরুষের উদ্দাম নৃত্য।

উপর-নীচ ঃ ১. অষ্ট গণদেবতা যাঁরা শান্তনু-গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মেছিলেন, ২. বিচারপতির আসন, ৩. বিষ্ণুপত্নী, লক্ষ্মী, কমলা, ৪. অপ্রয়দীক্ষিত-রচিত অলঙ্কার গ্রন্থের নাম, ৬. যে চিতার আগুন নির্বাণপ্রাপ্ত হয় না, লক্ষ্যার্থে—চির অশান্তি, ৯. উদাসীন আউল চাঁদ কর্তৃক উপদিষ্ট জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পালনীয় ধর্মবিশেষ, ১০. ভীম, ১২. রজনী, রাত্রি।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুনীল কুমার বিষ্ণু
সিউড়ি, বীরভূম

■	■	কী	র্তি	না	শা	■	পি
ও	জ	র	■	■	রি	■	ণ্ডা
■	ড়	■	স	■	কা	জ	রী
■	ভ	ড়	ং	■	■	র	■
■	র	■	■	ক্ষী	রো	দ	■
পূ	ত	না	■	ণ	■	গ	■
র্বা	■	জি	■	■	শ	ব	র
শা	■	না	ন্দী	মু	খ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ২৪